গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তেহট্ট

বার্ষিক পত্রিকা

ধনধান্য

শিক্ষাবর্ষ ২০২৩-২০২৪

মেনটর মেনটি সেশন (বাংলা বিভাগ)

মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ২০২৪

সিনেমা প্রদর্শনী ও বক্তব্য উপস্থাপন (বাংলা বিভাগ)

রিসোর্স পারসন অন রিসার্চ ম্যাথোডোলজি

কলেজ হোস্টেল

পোস্টার প্রতিযোগিতা

বাংলা বিভাগের পুনঃমিলন

বার্ষিক পত্রিকা-২০২৩ মোড়ক উন্মোচন

স্টুডেন্ট ফিডব্যাক সেশন

দেওয়াল পত্রিকার উদ্বোধন (ইতিহাস বিভাগ)

দর্শন বিভাগের সেমিনার

ধনধান্য

সপ্তম সংকলন ২০২৩-২০২৪

গভর্ণমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তেহট্ট

তেহট্ট, নদিয়া, পিন-৭৪১১৬০

ধনধান্য

সপ্তম সংকলন ২০২৩-২০২৪

প্রকাশক ও সত্ত্বাধিকারী ঃ
ড. শিবশংকর পাল, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

প্রকাশকাল ঃ
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৪

প্রচ্ছদ ঃ ড. শুভদীপ দেবনাথ

নামাঙ্কন ঃ
ড. শিবশংকর পাল

বর্ণ সংস্থাপনে ঃ
বাবাই বিশ্বাস

সম্পাদক ঃ
নীতীশ ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ)
প্রিয়া টুডু, সহকারী অধ্যাপক (দর্শন বিভাগ)

মুদ্রণে ঃ
আর্ট প্রেস
৭, সুভাষ এভিনিউ,
রাণাঘাট, নদীয়া।

গভর্ণমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তেহট্ট
তেহট্ট, নদিয়া, পিন-৭৪১১৬০

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা নং
১	**শুভেচ্ছা**	**ড. শিবশংকর পাল**	১
২	**বেলা শেষে**	লিপিকা মন্ডল	৫
৩	সত্যর সমাগম	রুবেল সেখ	৫
৪	স্বপ্ন	পার্থ শর্মা	৫
৫	**পূজা**	রিনা বিশ্বাস	৬
৬	**নারী**	**তনুকা মণ্ডল**	৭
৭	**কলেজ**	**তনুশ্রী হালদার**	৮
৮	**নীরবতা**	**অনুষ্কা বিশ্বাস**	৯
৯	**শিক্ষা জীবনে আমার প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের অবদান**	**পূজা দত্ত**	১০
১০	**ভারতের স্বাধীনতার মুক্তি সংগ্রামী ঃ সর্দার ভগৎ সিং**	**প্রিতম রায়**	**১১**
১১	বাঙালীর জীবনে নিতাই গৌররের অবদান	কৃষ্ণ কান্তি হালদার	১৪
১২	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্নিকন্যা বীনা দাস	প্রিতমা দাস	১৬
১৩	The Glorious World	Sunita Mondal	১৮
১৪	ইতিহাসের আলোকে তেহট্টের কৃষ্ণরায় জীউ মন্দির	পার্থ শর্মা	১৯
১৫	সমাজে নারীদের সমস্যা	সৌমি বর্মন	২১
১৬	বাংলার উৎসব	অসীমা দাস	২২
১৭	মিষ্টি'র লক্ষ্মীবাঈ	প্রতিমা দাস	২৪
১৮	ভগৎ সিং	পার্থ শর্মা	২৬
১৯	নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু	অর্পিতা হালদার	২৮
২০	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের অবদান	রুবিনা খাতুন	৩০
২১	সূর্য সেন ঃ এক অনন্য মুক্তিযোদ্ধার কাহিনী	দিশা গুঁই	৩২
২২	মৃত্যুঞ্জয়ী অমর শহীদ ক্ষুদিরাম	রিম্পা দে	৩৪
২৩	ইতিহাসের পাতা হতে, ভারতরত্ন আম্বেদকর সম্বন্ধে কিছু কথা	সৌম্যদীপ হালদার	৩৬
২৪	মৌমাছি ঃ একটি নিদর্শন	রুবেল সেখ	৩৮
২৫	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী	রাকেশ ধর	৪০

সম্পাদকীয়

প্রতি বছরের মতো এবছরও কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হলো কলেজের বার্ষিক পত্রিকা ধনধান্য। কলেজ পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে যে সমস্ত কবিতা, গদ্যধর্মী প্রবন্ধ, ছোট গল্প, রম্যরচনা, ছবি ইত্যাদি পাওয়া গেছে, সেগুলিকে যথাসম্ভব পরিমার্জন করে এই পত্রিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বিভাগীয় শিক্ষক ও কলেজের শিক্ষাকর্মীগণ পত্রিকার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। সাহিত্য প্রকরণগুলির স্থান লাভের ক্ষেত্রে শিল্পগুণকে একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় প্রায় সব ধরনের সাহিত্য প্রকরণ জায়গা করে নিয়েছে। যেখানে বর্তমানে প্রজন্মের ভাবনার অভিমুখকে অনুধাবন করা যেতে পারে।

ধন্যধান্য তো কেবলমাত্র একটি কলেজ পত্রিকা নয়। সমগ্র কলেজ পরিবারের মুক্ত মনের আবেগের একটি জায়গা। কলেজের জীবন্ত দলিল। পঠন-পাঠনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে সারা বছর ধরে কলেজে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড উদ্‌যাপিত হয়, ছবি আকারে পত্রিকার পাতায় সেগুলির সংযোজন পত্রিকাকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। ছবিগুলির সংগ্রহ ও নির্বাচনে সাহায্য করেছেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শুভদীপ দেবনাথ। তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. শিবশংকর পালের সুপরামর্শ সম্পাদকদ্বয়ের কর্মভারকে অনেকটাই লাঘব করেছে। আসলে পরিবারের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এই পত্রিকা। এরপরেও যদি কিছু ভুল-ত্রুটি থাকে তার দায় সম্পাদকদ্বয়ের। আর যাদের লেখা এই পত্রিকার মাধ্যমে মুদ্রণযন্ত্রের স্বাদ পেলো, সেই লেখা এবং লেখক আগামীতে বাকীদের উৎসাহের বীজ বপন করবে এই আশা রাখি। যা আমাদের সকলের কাছে এক অনন্য সম্পদ।

যুগ্ম-সম্পাদক
নীতীশ ঘোষ
প্রিয়া টুডু

সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে যাদুকরের ঝোলায়?

ড. শিবশংকর পাল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা)

কোভিডকাল অতিক্রান্ত। আমরা এর পরবর্তী জীবনে প্রবেশ করেছি। কিন্তু কোভিডের ক্ষত ও ক্ষতি আমাদের জীবনের সবখানে। সে তার দাঁতনখ কত গভীরভাবে বসিয়ে গিয়েছে তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি এখনও। আরও কতকাল এই ক্ষতির খতিয়ান বয়ে বেড়াতে হবে জানা নেই। কোভিড পূর্ব ও পরের জীবনে এত হেরফের, এত সংকট, জীবন এত এলোমেলো যে, পুরনো তিনটে শতাব্দীর মন্বন্তরগুলোকে মনে পড়িয়ে দেয়। আশ্চর্য এই যে, অতিমারীকালে এবং তারপরেও ফুলেফেঁপে উঠছে কয়েকজন হাতে গোনা ধনকুবের। অন্যদিকে দেশের অতি সাধারণ শ্রমনির্ভর মানুষ প্রতিনিয়ত কাজ হারাচ্ছেন, ক্রমশ রিক্ত হচ্ছেন, তাঁদের মুখের গ্রাস চলে যাচ্ছে কর্পোরেট-কুমিরের হাঁ-মুখে। কাজের বাজার ছোটো হতে হতে প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহ বাজারের সব দ্রব্যের মূল্য থার্মোমিটারের পারদের মতো ওঠা-পড়া করে না। কেবলই চড়তে থাকে। তার প্রভাব পড়ছে শিক্ষাঙ্গনেও। অতিমারির পরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাসত্রটি। কেবল যে এলোমেলো হয়ে গেল তাই-ই নয়, একটা বিরাট ব্যাপক ও সর্বাত্মক পরিবর্তনের মুখে পড়লো। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসের মতো সাধারণ বিষয়গুলিতে পড়ার আগ্রহ কমতে শুরু করলো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে ক্লাসের পাঠ নেওয়ার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংকোচন দেখা গেল। ছেলেমেয়েরা ঝুঁকতে শুরু করলো কারিগরি দক্ষতা অর্জনের দিকে; যাতে সে কোনওরকমে খেয়েপরে বাঁচতে পারে। এদিকে অনার্স হলো মেজর। তিন বছরের শিক্ষাগ্রহণকে টেনে চার বছর করে দেওয়া হলো। তাতে পড়ুয়াদের আগ্রহ বা অনাগ্রহ বিবেচিত হলো না। শিক্ষার মতো একটি অতি স্পর্শকাতর ও যৌথ তালিকাধীন বিষয়ের খোলনলচে বদলে দেওয়া হলো যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। এই আগাপাশতলা বদল কতটুকু আমাদের সমাজসভ্যতার অগ্রগতিতে সহায়ক হবে তা নিয়ে দেশের প্রায় সকল শিক্ষাবিদ ও বিদ্বজ্জনেরা চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। অনেকেই প্রতিবাদে মুখরও।

এদিকে দেশের স্বাধীনতা ৭৫ বছর পার করেছে। প্রধানমন্ত্রী ৭৫ পরবর্তী সময়কালকে 'অমৃতকাল' ঘোষণা করেছেন। আরও বলেছেন ২০৪৭ সালে এ দেশ হবে 'বিকশিত ভারত'। 'অমৃতকাল' ও 'বিকশিত ভারত' কথাগুলো শুনলে আমাদের পুলক জাগে; বুকের ছাতি চওড়া হয়। চোখে স্বপ্নের ঘোর লাগে। কিন্তু আমরা যে ঘরপোড়া গরু, কেবল সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই তা-ই নয়, মিষ্টি মিষ্টি কথাও আমাদের ভয় ধরিয়ে দেয়। আমাদের অভিজ্ঞতা যে করুণ থেকে করুণতর! আমরা আগেও জানতাম, এখনও জানি দুনিয়ার দেশগুলিকে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে অবিকশিত (under developed), বিকাশের পথে (developing) ও বিকশিত (developed) -এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বর্তমানে আমরা এই তিন শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আগামী বিশ বছর পরে আমাদের দেশের মাথায় বিকশিত শ্রেণীর আভিজাত্যের মুকুট পরানো হবে। এ বড়ো শ্লাঘার বিষয় অবশ্যই।

কিন্তু মনের মধ্যেকার খুঁতখুঁতুনি কিছুতেই স্বস্তি দেয় না। কেন দেয় না, সেটাই বলি। অর্থনীতিবীদরা কী বলবেন জানি না, কিন্তু একজন শিক্ষক হিসেবে মনে হয়, যে মানদন্ডে এই শ্রেণী বিভাজন করা হয় তার সবটা গ্রহণযোগ্য কি? কারা এই মান বা সূচক নির্ধারণ করেন? অর্থনীতিরও তো অনেক পয়জার আছে! সে-সব কি মাথায় রেখে আমরা একটা দেশের অগ্রগতি মাপতে পারি? সকলেই কি বিশেষজ্ঞ? এই সূচক নির্ধারণে অর্থনীতিবিদ ছাড়া আর কোন কোন ধ্যানধারণার বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হয়? এই সকল জিজ্ঞাসার কোনও সদুত্তর তো কোনওখানে দেখি না। বিকশিত হওয়ার জন্য যে সুদূরপ্রসারী বাস্তবোচিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজন সে বিষয়ে সরকার পারাঙমুখ নালিঘাস। আমাদে খাদ্য যেন খড়-বিচালি-ঘাস!

একটা দেশের প্রকৃত অগ্রগতির সূচক কী? কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন? উন্নয়ন কি কেবল ফ্লাইওভার ও শমিংমলের চোখধাঁধানো চাকচিক্যের জ্যোৎস্না? সেই জ্যোৎস্নার চাদর কেন একটি-দুটি বিনিয়োগকারীর হাতে? পাড়ার মুদির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাজারে শাকসবজি বেচা মহিলার কাঁচামাল চলে যাচ্ছে শপিংমলের স্টোরে। অনেক বেশি দাম দিয়ে আমরা বাসি হয়ে হয়ে যাওয়া সবজি কিনছি। মুদির দোকানদার পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে চলে যাচ্ছেন অন্য রাজ্যে বা দেশে। আর সবজিমাসি হয়ে উঠছেন ঠিকে কাজের মাসি কিম্বা একশ দিনের শ্রমিক! একে কি আমরা উন্নয়ন বলবো?

এ তো গেল প্রশ্নের একটা দিক। এর আরও একটা দিক রয়েছে। এবং সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটা জাতি সব দিক থেকে মজবুত ও শক্তিশালী হয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতিতে, বিস্তারে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির শক্তিকেন্দ্র হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানে কেবল প্রযুক্তি, কারিগরি বা চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্র নয়; সাধারণভাবে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান ও গবেষণার পরিসরটি সবচেয়ে মূল্যবান। কারণ এই জ্ঞানসাধনাই আমাদের মানবসমাজের অন্তর্লীন বন্ধনকে ক্রমাগত পোক্ত করে। সমাজমনকে সংস্কারমুক্ত করে, করে বিজ্ঞানমনস্ক। আনুগত্য নয়, প্রশ্নশীল মনই সমাজের অগ্রগতির দ্বান্দ্বিক শক্তি। যে বৈজ্ঞানিকরা চাঁদে রকেট পাঠানোর আগে যাগযজ্ঞ করেন, তাঁরা যত বড়ো বৈজ্ঞানিকই হোন কেন, কিছুতেই বিজ্ঞানমনস্ক নন।

এ তো গেল প্রশ্নের একটা দিক। এর আরও একটা দিক রয়েছে। এবং সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটা জাতি সব দিক থেকে মজবুত ও শক্তিশালী হয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতিতে, বিস্তারে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির শক্তিকেন্দ্র হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানে কেবল প্রযুক্তি, কারিগরি বা চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্র নয়; সাধারণভাবে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান ও গবেষণার পরিসরটি সবচেয়ে মূল্যবান। কারণ এই জ্ঞানসাধনাই আমাদের মানবসমাজের অন্তর্লীন বন্ধনকে ক্রমাগত পোক্ত করে। সমাজমনকে সংস্কারমুক্ত করে, করে বিজ্ঞানমনস্ক। আনুগত্য নয়, প্রশ্নশীল মনই সমাজের অগ্রগতির দ্বান্দ্বিক শক্তি। যে বৈজ্ঞানিকরা চাঁদে রকেট পাঠানোর আগে যাগযজ্ঞ করেন, তাঁরা যত বড়ো বৈজ্ঞানিকই হোন কেন, কিছুতেই বিজ্ঞানমনস্ক নন।

অনেক কাল আগে, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক দোল সংখ্যায়, তুর্কি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রেজাউল করীম লিখেছিলেন, 'যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতির সভ্যতার দাবী বৃথা। সভ্যতার প্রধান মানদন্ড হইতেছে সাহিত্য। যে জাতির সাহিত্য যে পরিমাণে উন্নত তাহার সভ্যতাও সেই পরিমাণে সমৃদ্ধিশালী।" আদ্বিজচণ্ডালের প্রণতিতে তাঁর চরণযুগল সংস্কৃতির সমন্বয়ের রজে রঞ্জিত ও গর্বিত। আমার তরুণবেলায় গবেষণা করবার সময় প্রথম সেই প্রবন্ধ পড়ি। একবার তাঁকে প্রণাম করার সুযোগ হয়েছিল। প্রণতি জানিয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, সভ্যতার উন্নতির একমাত্র মানদণ্ড সাহিত্য? আর কিছু নয়? অশীতিপর মানুষটি উত্তর দিয়েছিলেন, সাহিত্য যে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সমাজতত্ত্ব দিয়ে গড়া। তাই জীবনের সারাৎসার হয়ে ওঠে সাহিত্য। সাহিত্য না পড়লে যথার্থ মানুষ হওয়া যায় না। বলেছিলেন, বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস --- জ্ঞানবৃক্ষের এই শাখাগুলি নবপর্ণের যে মৃদুল ছায়া দেয়, ফুলফলের যে আস্বাদ ও ঘ্রাণ পাওয়া যায় তা-ই হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মজল।

আজ এই মর্মজলের উৎসগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। দেশের অগ্রগতির জন্য কারিগরি, প্রকৌশলী, তথ্য প্রযুক্তি ও চিকিৎসার মতো বিদ্যাচর্চার যেমন প্রয়োজন, তেমনি পাশাপাশি দেশের মানসসম্পদ বাড়ানোর জন্য সাধারণ শাখার জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ততটাই বা তারও অধিক জরুরী। কারণ, দেশের মানব সম্পদের সুতোয় গাঁথা হয় বিবিধের জীবনপুষ্প। প্রধানমন্ত্রী আমাদের অমৃতকালের কথা

বলেছেন। কিন্তু তার ব্যাখ্যা দেননি। কী সেই অমৃত? সহস্র বছরের ভারতীয় জীবনসাধনার ধারায় আমরা দেখেছি ঐক্যপত্রের বিরুদ্ধে পরস্পর দেওয়া ও নেওয়া, মেলা ও মেলানোর ঐক্যতান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মাটি যেমন বিচিত্র, তেমনি মানুষ ও তার যাপনকলাও বৈচিত্রময়। সহস্র বছর পরেও এত বৈচিত্রের মধ্যেও ভারতের জীবনযাপনের অন্তর্লীন মর্মবস্তুটি হলো ভারতীয় হয়ে থাকা। চেহারায়, অশনে-বসনে, চলায় বলায় কত না বিবিধতা। কিন্তু ধমনীর রক্ত এক। এর মৃত্যু নেই; বিনাশ নেই; আছে কেবল বিকাশ। আছে বিস্তার। এই হলো আমাদের অমৃত। তাই আমরা অমৃতের সন্তান। এই অমৃত রয়েছে ভারতের জ্ঞানসাধনায়, সঙ্গীতসাধনায়, সাহিত্যসাধনায়, বিজ্ঞানসাধনায় তথা জীবনসাধনায়। সাধনাই তো বটে। কারণ শত শত বছর ধরে বহু শাসকের শাসন পেরিয়েও আমরা সেই অমৃতধারাকে বহন করতে সক্ষম হয়েছি। যে শিক্ষার মাধ্যমে আমরা এই অমৃতের স্বাদ ও সন্ধান পাই আজ তা সত্যিই বিপন্ন। তাই শিক্ষাব্রতীদের উদ্বেগকে উড়িয়ে দিতে পারি না।

বিপন্ন---কেননা, ক্রমাগত বছর বছর শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। সরকারি দায় থেকে মুক্ত করে শিক্ষাসত্রটিকে তুলে দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেট কর্তাদের হাতে। অর্থাৎ শিক্ষার বণিকীকরণ শুরু হয়েছে। অস্যার্থ, শিক্ষা আর অধিকার নয়, একটি পণ্য মাত্র। সেটি বাজার থেকে কিনতে হবে। তাই শিক্ষক নিয়োগ ক্রমশ কমছে। জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০)-র মাধ্যমে পাঠ্যক্রমে যে-সকল পরিবর্তন এসেছে তার পিছনে রয়েছে একটি বিশেষ অভিসন্ধি এবং তা আর গোপনও নেই। পুরাণের গালগল্প ও ম্যাজিককেই ইতিহাস বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। একটা বিরাট অংশের ইতিহাসকে মুছে ফেলা হচ্ছে বা তার ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। হাতেগরম এর ফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। অহিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অতি দ্রুত হারে বাড়ছে অবমাননা ও উপেক্ষা। খাদ্যসংস্কৃতির উপর আসছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার 'অপরাধে' নেট পাশ করা সংস্কৃত পন্ডিত ও গবেষককে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। এই বিষ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সমাজের গভীরতর স্তরে। যা আমাদের ঘোষিত অমৃতকালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান।

২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে কলেজের বার্ষিক পত্রিকা ধনধান্য-এর শুভেচ্ছা বার্তায় এই সব কটু কথা বলতে ভালো লাগছে না। পড়তেও ভালো লাগবে না জানি। কিন্তু সত্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। আর আমারা উটপাখিও নই। যদিও এই প্রলয়কালে আমরা অনেকেই বিশেষত 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় বালিতে মুখ বুজে কালক্ষেপ করছি। জানি না মহাকাল আমাদের ক্ষমা করবে কি না। রঙবেরঙের জাদুকরের পোশাক ভালো, তার জাদু দেখতে ভালো। তবু মনে রাখতে হবে সেটা সত্য নয়। সেটা একটা কৌশল। কুশলতায় ছোটোরা ভোলে, স্বাভাবিক; কিন্তু বড়োরা ভুললে অনেক কিছু রসাতলে যায়, যদি বড়োরা, শিক্ষিতরা সেই কৌশলের পিছনের অভিসন্ধি ধরতে না পারেন। আসুন রবীন্দ্রনাথের একটা গান শুনি---

সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?
খাঁটি জিনিস হয় রে মাটি নেশার পরমাদে।।
কথায় তো শোধ হয় না দেনা, গায়ের জোরে জোড় মেলে না--
গোলেমালে ফল কি ফলে জোড়াতাড়ার ছাঁদে?
কে বলো তো বিধাতারে তাড়া দিয়ে ভোলায়?
সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে জাদুকরের ঝোলায়?
মস্ত-বড়োর লোভে শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে,
ব্যস্ত-আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফাঁদে।।

ইতিহাস বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা উদ্বোধন

রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন

শিক্ষক দিবস পালন

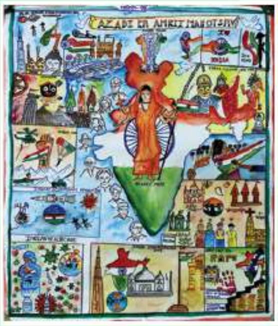

রাকেশ ধর, ষষ্ঠ সেমিস্টার
তৃতীয় স্থান অধিকারী

জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব চিত্র দিবস উদ্‌যাপন

তিথি ঘোষ

মহঃ আরোপ আলি, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী (যুগ্ম)
ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা

শ্রেয়া রায়, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী (যুগ্ম)
ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা

ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেশন

ডেঙ্গু সচেতনতা (এন.এস.এস.)

সেমিনার (ইতিহাস বিভাগ)

সিনেমা প্রর্দশনী (বাংলা বিভাগ)

বেলা শেষে

লিপিকা মন্ডল, দর্শন বিভাগ (৬ষ্ঠ সেমিষ্টার)

আমারও ছিল আনেক স্বপ্ন,ছিলাম হয়ে রাজ কন্যা।
সোনালী অতীতের রঙিন দিনে, রূপ-যৌবনে ছিলাম অনন্যা।
চোখে কাজল,পায়ে নূপুর, ছিল ঘন কালো কেশ ।
মেঘ বালিকা হয়ে ছুটতাম, জীবন ছিল মোর বেশ।
চার বেহারার পালকি চড়ে, এসেছিলাম যেদিন নব বধূর সাজে ।
কত কল্পনা, কত সাধনা ছিল আমার মনের মাঝে।
ছিলাম কন্যা, হলাম বধূ, হলাম আমি মা জননী।
দিন বদলের পালা শেষে কেটে গেল কত রজনী।
জীবন নদের মোহনা তীরে,আমিও একা সারথি।
শেষ বিকালে পৌঁছে গেছে, আমার জীবনের চলার গতি।
বেলা শেষে আমি এখন, কার যে পথের সাথী?
ভেবেই ব্যাকুল আমার মন কাটছে দিবা-রাত্রি।

স্বপ্ন

পার্থ শর্মা, ইতিহাস বিভাগ (৩য় সেমিষ্টার)

দু-চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে
পিতা-মাতা এনেছিল এই ধরাধামে।
ছোট্টো শিশুটি আজ হয়েছে বড়ো।
বয়সটা গেছে উনিশ পেরিয়ে।
সুজ্ঞান,কুজ্ঞান, চিন্তা চেতনা ভাবনা।
মনের ভিতর নাড়া দিচ্ছে নিত্যসাধনা
ভবিষ্যৎ এর চিন্তা তার মনে বিদ্যমান।
আকুল ভরা স্বপ্ন দেখছে তাহার মনপ্রাণ।
স্বপ্নপূরনের মার্গে সে এখন ধাবিত
লক্ষ্য তাঁর বড়ো কিছু নয়কো সীমিত।
ভাগ্য বিধাতা দেয় যদি তাহার সঙ্গ
পূরণ করবে একদিন সে নিজের স্বপ্ন।

সত্যর সমাগম

রুবেল সেখ, বিজ্ঞান বিভাগ (৩য় সেমিষ্টার)

জীবন কাঁদছে, মৃত্যু হাসছে,
এরই মাঝে আবদ্ধ-শ্বাস।
অরাজকতা,অধর্মতা,অত্যাচার-নেই বিচার,
সবই যেন রোজ।
এরই মাঝে আমি কি একা?
আর থাকেও যদি কোথায় তবে তারা?
সবই যেন ফাঁকা,অমনুষ্যত্ব ছাড়া।
এই কালোযুগে হবে সুদূরে
সত্যর সমাগম
হবে প্রাচীন ভেদ,গড়বে নতুন দেশ।
যাবে এসব চলে,হবে শান্তি কায়েম।
শান্তিতে থাকবো মোরা।

পূজা

রিনা বিশ্বাস, দর্শন বিভাগ (৩য় সেমিষ্টার)

অভাব আছে স্বভাবের অন্তরে নাই ভক্তি,
আয়োজন করিয়াছ বৃথা পূজা শক্তি।
আত্মনিবেশ করনিতো ঈশ্বরের ঐ চরণে,
ছয় রিপু বলি দাও নাই অর্থ দিয়াছ দানে।
কারসাজিতে পরিপূর্ণ মন হয়নি তো রূপান্তর,
শুধু পাবার প্রত্যাশা ভঙ্গিমা অপূর্ব সুন্দর।
কার পূজা কে করে ভাবভক্তি নাই অন্তরে,
লৌকিকতার মাঝে অলৌকিক সাজে বিরাজিত আত্ম অহংকারে।
মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়াছ শত কামনা করিয়া,
কী হবে এই মিথ্যা পূজা দিয়া?
জীবন পথে করে সংহার,
অন্ধকার ছেড়ে আলোকের নীড়ে হও অগ্রসর।
হৃদয় মাঝে শক্তি রূপিনী কর পূজা,
রক্ষিবে তব সর্বদা যেন হয়ে দশভূজা।
ধনসম্পদ অর্থকড়ি বৃথা সবই নয়ত দামী,
রইবে নাকো আড়াল কিছু সে যে অর্ন্তযামী।
শেষের দিনে হবে বিচার যত সব বিস্তারিত স্মৃতি,
থাকিতে দেহে শক্তি কর ঈশ্বর স্তুতি।

নারী

তনুকা মণ্ডল দর্শন বিভাগ (৫ম সেমিস্টার)

শিশু কন্যা নিয়ে কি
আমরা গর্ব করতে পারি?
শিশু কন্যা বড়ো হলে
তখন হবে একটা নারী।

শিশু কন্যা জন্মালে
কেন এত দুঃখ?
কেন বা এতই কষ্ট
শিশু কন্যা জন্মালে
আজও কেন করিনা আমরা আনন্দ।

আজ যে শিশু কন্যা
কাল সে নারী।
আর যে হয় নারী সেই হয় জগৎধারিণী
তবে কেনো এত দুঃখ?
কেনই বা এত কষ্ট?

যে দেশেতে নারী হয় পূজিত
আবার সেই দেশেতে নারীকে করা হয় ধর্ষিত।
কেমন এই সমাজ কেমন এই দেশ!
বোঝা বড়ো দায় যে
আমাদের এই পরিবেশ।

কেনো করো নারীকে অসম্মান
নারীর নেইকো কোনো সম্মান।
করছো নারী পূজা,
আবার করাচ্ছো নারীর অসম্মান।
এবার মোরে আর নারী কোরো না
কোরো রোকেয়া, চন্দ্রমুখী
কিংবা কাদম্বিনী,
ইতিহাসের পাতায় তারা আজও
হয়ে আছেন বিজয়ীনি।
ওঠো তুমি ওঠো জাগো তুমি নারী।

অবহেলার বিষয়বস্তু
নও যে তুমি নারী।
আর নারী, নেইকো কোনো তোমার ভয় ভীতি।
অনেক নারী পেয়েছে আজ
চিকিৎসার স্বীকৃতি।

কলেজ

তনুশ্রী হালদার দর্শন বিভাগ (৩য় সেমিষ্টার)

স্কুল জীবন শেষ করে এলাম কলেজে,
দু-একজন বাদে অচেনা লাগল সবাইকে।
প্রথম প্রথম একা থেকে মনটা উদাস হল,
নবীন বরণে এসে কত বন্ধু হয়ে গেল।
কলেজ মানে হাসি ঠাট্টা পড়ার মাঝে মাঝে,
ইচ্ছামত পড়তে পারে সবাই কলেজে।
স্কুলেতে পড়ত সবাই একই বিষয় আগে,
কলেজেতে পড়ে যার যেটা ভাল লাগে।
লাইব্রেরীতে নিরবতা সবাই পালন করে,
সেখানে বসে নানান বই ছাত্র ছাত্রীরা পড়ে।
কলেজে এসে ভালবাসার ছোঁয়া লাগে মনে,
তাই প্রেমিক - প্রেমিকা গল্প করে নির্জন ক্লাসের কোণে।
খেলাধূলাও চলে ওই নিজেদেরই উদ্যোগে,
বন্ধু বান্ধবী আড্ডা করে কলেজ ক্যান্টিনে।
বন্ধু বান্ধবী যে যা পারে বিভিন্ন খাবার আনে,
ক্যান্টিনে বসে কেউ আবার মত্ত ধুমপানে।
সংসদের দাদারা থাকে সংসদের ওই ঘরে,
ছাত্র ছাত্রীদের সমস্যা হলে দাদারা - দিদিরা সমাধান করে।
ভালো করে পড়ার কথা দাদারা আমাদের বলে,
পড়ার পাশে কলেজে একটু রাজনীতিটাও চলে।
সবমিলিয়ে কলেজে হয় মুক্ত বাধায় পড়া,
স্বেচ্ছাবাহী পড়াশোনা কলেজে হয় সেরা।

নীরবতা

অনুষ্কা বিশ্বাস, ইংরেজী বিভাগ (১ম সেমিস্টার)

কিবা লিখতে পারি তোমার জন্যে
লেখার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে,
বছর কয়েক আগে।
তোমাকে লেখা কবিতাগুলো
আজ চাপা পড়ে গেছে
অতল স্মৃতির ভাঁজে।

আতরের গন্ধে চারিদিক ভরে ওঠে
তবে মন আজ গন্ধহীন থাকে।
জুঁই ফুলের গন্ধটা বড্ড মনে পড়ে।
এখন আর কিনতে ইচ্ছা করেনা।
তোমার কথা মনে পড়ে বড্ড
তাই পিছিয়ে আসি,
বিরত রাখি নিজেকে।
প্রতিদিন আমার জন্য মুঠো মুঠো
জুঁই কুড়িয়ে আনতে তোমার
ছাদবাগান হতে।

এখন বুঝি অন্য কারোর জন্য আনো?
চিঠিগুলো এখন কাকে লেখো?
জানতে ইচ্ছা করছে।

কথারা আজ ভাষা হারিয়েছে।
কথা বলতে ইচ্ছা করেনা আর।
নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি সবরকম ভাবে।
আমার মনের শহরও আজ নিস্তব্ধ।
অভিমানের কালো মেঘ এসে
মাঝে মাঝে ভিজিয়ে দেয়
এক পশলা বৃষ্টি হয়ে।
তোমার দেখা চঞ্চল মেয়েটা আজ
বড্ড শান্ত হয়ে গেছে।
প্রয়োজনের বেশী কথা বলেনা
গান গায় না আগের মতো।
মনে পড়ে তুমি প্রথম কি নামে
ডেকেছিলে আমাকে?
নাকি সেসব বড্ড পুরোনো স্মৃতি হয়ে গেছে
তোমার ডাইরির পাতার ভাঁজে।
শব্দেরা ঝরে পড়ে বৃষ্টির মতো।

আমার জীবনে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।
একাকীত্ব আর নিঃসঙ্গতাকে
আপন করেছি যে।
তাদেরই ভালোবাসি মনে প্রাণে।
তারা বেশী কথা পছন্দ করেনা।
তারা ভালোবাসে নীরবতা।

সেই জন্যেই তো
আপন করেছি নীরবতাকে।
তবু আজ ইচ্ছা হলো
একটু লিখি তোমার জন্য।

প্রেম দিবস না হয় রইলো না
আমাদের মাঝে।
কবিতা দিবস তো থাকতে পারে
দুজনের মনের মণিকোঠায়,
উজ্জ্বল স্মৃতির ভাঁজে।

শিক্ষা জীবনে আমার প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের অবদান

পূজা দত্ত, দর্শন বিভাগ (৫ম সেমিষ্টার)

সূচনা ঃ- ছাত্রজীবনে যারা আমাদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে - আলোর পথ দেখান, তাঁরাই আমাদের শিক্ষক। তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিলিয়ে দেন। তারাই মানুষ গড়ার কারিগর। এই সকল শিক্ষক, শিক্ষিকাগণ আমাদের মনে আলাদাভাবে জায়গা করে নেন এবং হয়ে ওঠেন আমাদের প্রিয় শিক্ষক, শিক্ষিকা। ঠিক সেইরকম আমারও কিছু প্রিয় শিক্ষক, শিক্ষিকা রয়েছেন।

আমার প্রিয় শিক্ষক ও শিক্ষিকা ঃ- প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে আমি অনেক শিক্ষক, শিক্ষিকার সাহচর্য পেয়েছি। তবে সকলের মধ্যে আমার কাছে আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষিকা হিসাবে হৃদয়ের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছেন আমার মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ। তাঁদের কাছে আমি বিভিন্নভাবে লাভ করেছি জীবনে চলার পাথেয়। তাঁদের পড়ানোর ধরণ, গুণাবলী, চলাফেরা, কথা বলার ধরণ সব কিছুই আমাকে মুগ্ধ করে। তাঁদের সততা, নিষ্ঠা এবং ব্যক্তিত্ব আমার কাছে তাঁদের এক আদর্শ মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছে।

শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঃ- মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় যখন আমি স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে 'স্নাতক' যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হই। প্রথম দিন যখন মহাবিদ্যালয়ে গেলাম, সেখানকার সবকিছুই আমার কাছে অপরিচিত ছিল। নতুন মুখের সমারোহে প্রথম ক্লাসে প্রবেশ করলাম। ধীরে ধীরে, নিজের ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক শিক্ষিকার বন্ধুসুলভ আচরণ , নিষ্ঠা এবং সহমর্মিতা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করতে শুরু করে এবং সেইদিন থেকেই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা আমার মনের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিলেন।

আমার জীবনে শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণের অবদান ঃ- আমার জীবনে মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণের অবদান অনস্বীকার্য। কেননা, পড়াশোনার বিষয় ছাড়াও অন্যান্য কোনো বিষয়ে কোনোরকম সমস্যা নিয়ে তাঁদের কাছে গেলে কখনো নিরাশ হইনি। প্রতিটি বিষয় তাঁরা সময় নিয়ে আমাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষক ও শিক্ষিকার কাছে আমি লাভ করেছি প্রিয় ছাত্রীর মর্যাদা। উনারা পড়াশোনাতে আমাকে উৎসাহিত করে আমার জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন। সর্বোপরি একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আমার জীবনে মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকাগণ অনস্বীকার্য অবদান রেখেছেন।

উপসংহার ঃ- শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক গণ্ডি পেরিয়ে, স্নাতক যোগ্যতার তৃতীয় বর্ষ অর্থাৎ সর্বশেষ বর্ষে পদার্পন করেছি। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আমি যেখানেই থাকি না কেন বা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই না কেন, আমার দেখা শিক্ষক ও শিক্ষিকার মধ্যে আপনারা সবসময় সর্বোচ্চস্তরে অবস্থান করবেন। আপনাদের আদর্শ আমার জীবনে প্রতিফলিত হয়ে থাকার মতো। ভুলবোনা কোনোদিন আপানাদের। শুধু একটিই মনোস্কামনা, আপনাদের অনুসরণ করে এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

ভারতের স্বাধীনতার মুক্তি সংগ্রামী ঃ সর্দার ভগৎ সিং

প্রিতম রায়, ইতিহাস বিভাগ (১ম সেমিষ্টার)

ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে যে কয়েকজন বীর বিপ্লবীদের পরিচয় আমরা পাই, তাদের মধ্যে ভগৎ সিং অন্যতম এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের লায়ালপুর জেলার নিকটস্থ খাতকর কালান গ্রামের এক জাঠ সান্ধু শিখ পরিবারে এই মহান বিপ্লবীর আর্বিভাব হয়। পিতা সর্দার কিষাণ সিং সান্ধু ও মাতা বিদ্যাবতী। পরিবারের সকলেই প্রায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশপ্রেমিক শিখ পরিবারের সদস্য ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগৎ সিং - এর আর্বিভাব হয়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের কিছুদিন পরেই চৌরি - চৌরা গনহিংসায় কয়েকজন পুলিশকর্মীর মৃত্যুতে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে হতাশাগ্রস্ত ভগৎ সিং যুব বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন, যেমন নওজোয়ান ভারতসভা, কীর্তি কিষাণ পার্টি ও হিন্দুস্থান স্যোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন। প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধে এক ব্রিটিশ পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিস্টার স্যাণ্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করেন। ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে নবরাত্রিতে লাহোরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে তাঁকে লাহোর বোমা বিস্ফোরন মামলায় গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পাঁচ সপ্তাহ পরে জামিনে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর ভগৎ সিং উপলব্ধি করেন যে গান্ধীজীর নরম পন্থী মতাদর্শের মধ্য দিয়ে ভারতকে কোনোদিনও স্বাধীন করে তোলা সম্ভব হবে না। তাই তিনি গান্ধীজীর মতাদর্শের বিরোধিতা করেন এবং তারপর থেকেই তাঁদের মধ্যে একটি সংঘর্ষের ঠাণ্ডা লড়াই সর্বদা চলতে থাকে। এরপর ভগৎ সিং চন্দ্রশেখর আজাদ নামের এক মহান বীর বিপ্লবীর সন্ধান পান এবং তাঁর দলে যোগদান করবেন বলে মনস্থির করেন। চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি তাঁদের দলে যোগদান করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। তবে চন্দ্রশেখর ভগৎ সিংকে নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথের সঙ্গী হিসেবে মানতে নারাজ ছিলেন। ভগৎ সিং যখন তাঁকে বলেন যে এই চারদেওয়ালের মধ্যে বসে থেকে স্বাধীনতার সূর্যোদয় দেখা সম্ভব নয়, তখন চন্দ্রশেখর ভগৎ সিংকে বলেন যে চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে এইসব কথাগুলো বলা সম্ভব কিন্তু যখন ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে তাদের বিভিন্ন রকমের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে তখন এই জোশ এবং সাহস সমস্তই মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। তখন ভগৎ সিং দু পা এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত উনুনের উপর হাত রাখেন এবং তিনি পবিত্র অগ্নির উপর হাত দিয়ে শপথ করেন যে ভারতের স্বাধীনতার পথে যত রকমেরই বিপদের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয় তিনি হবেন এবং প্রায় ৪ মিনিট ধরে তিনি একটি সংগীত গান --

"যতক্ষণ নিশ্বাস আছে, ততক্ষণ এগিয়ে যাওয়া থামাব না
যখন যুদ্ধে নেমে পড়েছি তখন লক্ষ্য প্রাপ্ত করেই ছাড়ব।
জীবন প্রিয় নয় ভারতমাতার থেকে আমাদের, মরতে মরতে
আমরা একথা সকলকে বলে যাব।"

তখন চন্দ্রশেখর আগুনের মধ্য থেকে ভগৎ সিং - এর হাতটিকে এক ঝটকায় সরিয়ে দেন এবং নিজেদের দলে তাঁকে শামিল হওয়ার অনুমতি দেন। ইতিমধ্যেই ভগৎ সিং - এর বাড়ি থেকে চিঠি আসে, তার মা অসুস্থ এবং তিনি সন্তানের চিন্তায় ভারাক্রান্ত। তখন ভগৎ সিং বাড়ি ফিরে যান এবং তার মা সুস্থ হয়ে ওঠেন। এরপর ভগৎ সিং জানতে পারেন যে তার বিনা অনুমতিতেই তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তখন তিনি কিছুটা দুঃখিত হন এবং চন্দ্রশেখরের কাছে ফিরে

যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েন। তখন তাঁর মা তাঁকে বলেন যে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করে কি তাঁরা অনেক বড় ভুল করে ফেলেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগৎ সিং বলেন যে এই বিয়েটা তার পক্ষে করা সম্ভব হবে না কারণ তিনি নিজের জীবন সম্পূর্ণরূপে দেশের নামে করে দিয়েছেন এবং তিনি এও বলেন পরাধীন ভারতে যদি তার বিয়ে হয়, তাহলে একমাত্র মৃত্যুই তার স্ত্রী হবে। এরপর চন্দ্রশেখর আজাদ তার দলকে নিয়ে খরদহ থেকে লক্ষ্ণৌ - এর দিকে যেতে থাকা ইংরেজদের সাহারানপুর লোকাল ট্রেনে হামলা করেন টাকাপয়সা ও রাইফেল এবং লোটা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এই হামলায় চন্দ্রশেখর আজাদের দলের এক মহান বীর রামপ্রসাদ বিসমিলসহ, আসফাক, রসান, লাহিড়ী, হায়দারসহ আরও অনেকে ইংরেজদের হাতে গ্রেফতার হন। একথা শুনতে পেয়ে ভগৎ সিং শীঘ্রই চন্দ্রশেখর আজাদের কাছে ফিরে যান। চন্দ্রশেখর ভগৎ সিংকে বলেন যে সমস্তরকম বন্দোবস্তো রাতের মধ্যেই সেরে ফেলতে। তারা কালই তাদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনবেন। কিন্তু ভগৎ সিং চন্দ্রশেখরকে বলেন যে কাল নয় তারা বরং আজ রাত্রিতেই তাদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনবেন। ভগৎ সিং - এর এই সাহস দেখে চন্দ্রশেখর আজাদ কিছুটা চমকে ওঠেন। এরপর ভগৎ সিং চন্দ্রশেখরের কথা মত লালা লাজপত রায় - এর সাথে দেখা করতে যান এবং লালা লাজপত রায়সহ তিনি সাইমন কমিশন বিরোধী একটি শান্তিপূর্ন আন্দোলনে যোগদান করেন। তবে এই আন্দোলন করতে গিয়ে ইংরেজদের লাঠির আঘাতে লালা লাজপত রায় শহীদ হন। প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং লালা লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধে হিন্দুস্থান স্যোশালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে শিবরাম রাজগুরুকে সাথে নিয়ে এক ব্রিটিশ পুলিশ সুপার জেমস স্কটকে হত্যা করতে চাইলে ভুলবশতঃ ২১ বছর বয়সী ব্রিটিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিস্টার স্যান্ডার্সকে প্রথমে বোমা মেরে আহত করেন, তারপর তিনি কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করেন। ভগৎসিং ও রাজগুরু পালিয়ে যাওয়ার সময় একজন ভারতীয় পুলিশ কনস্টেবল ধাওয়া করলে চন্দ্রশেখর আজাদ চেন্নান সিং কে গুলি করে হত্যা করেন।

পালিয়ে যাওয়ার পর ভগৎ সিং ও তার সহযোদ্ধারা প্রকাশ্যে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এরপর ভগৎ সিং কিছুদিন পলাতক থাকার পর পিতার সুপারিশ মত ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে এক সহযোগী বটুকেশ্বর দত্তের সহযোগে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় বিধায়সভায় কম তীব্রতার দুটি বোমা ফেলেন। গ্যালারী থেকে নীচে বসে থাকা বিধায়কদের উপর লিফলেট বর্ষণ করে স্লোগান দেন ও কর্তৃপক্ষকে গ্রেফতার করার অনুমতি দেন। গ্রেফতারের পর স্যাণ্ডার্স হত্যাকারী মামলায় কারাবাস করেন। এমতাবস্থায় চন্দ্রশেখর আজাদ ভগৎ সিংকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য ফন্দি আঁটছিলেন। তবে ইংরেজ সৈন্যরা চন্দ্রশেখরের অবস্থান শনাক্ত করতে পেরে তার উপরে অচমকা গুলি বর্ষণ করতে শুরু করেন। তবে তাতে চন্দ্রশেখরের কিছু ক্ষতি হয় না। তবে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি এতগুলো ইংরেজ সৈন্যদের সাথে একা পেরে উঠবেন না। অতঃপর তার হাতে থাকা একটি বন্দুক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা একটি গুলি খেয়ে দেশের মাটি হাতে নিয়ে শহীদ হন। ভারতের স্বাধীনতার পথ অনেকটা থমকে যায়।

অন্যদিকে বিচারের অপেক্ষায় ভগৎ সিংসহ বিপ্লবী যতীন দাস কারাগারে ভারতীয় বন্দীদের ভালো অবস্থার দাবিতে অনশন করতে থাকেন। দীর্ঘ ৬৪ দিন অনশন করার পর অনাহারে যতীন দাসের মৃত্যু হয়। এরপর জন স্যাণ্ডার্স ও চেন্নান সিং হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন। জেলের মধ্যে বন্দী থাকাকালীন ভগৎ সিং বিভিন্ন ছড়া, অজস্র গান রচনা করেন। অন্যান্য বিপ্লবীদের সাহস অটুট রাখার জন্য। ইংরেজ সরকার বুঝতে পারে যে এভাবে ভারতীয়দের দমন করা যাবে না। তাই তারা অসংখ্য ফন্দী আটতে থাকেন এবং ভগৎ সিং - এর উপর চরম নির্যাতন চালান। তাঁকে খালি গায়ে বরফের চাঁইয়ের উপর শুইয়ে দিয়ে চাবুক দিয়ে মারা হয় এবং অতঃপর গায়ে লবন মাখিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে দীর্ঘদিন তাঁর উপর নির্যাতন চালানোর পরে ইংরেজ সরকার বুঝতে পেরেছিল যে এইভাবে ভারতীয়দের তথা ভগৎ সিংকে দমিয়ে রাখা যাবে না। অন্য কেউ হলে হয়ত হাল ছেড়ে দিত। তবে সে তো ভগৎ সিং। ভারতমাতার মহান বীরপুত্র সে। জেলে বন্দী থাকাকালীন তাদের প্রতিমাসে একবার করে আদালতে নিয়ে যাওয়া হত বিচারের জন্য। তারপর একদিন

ভগৎ সিং জেলার সাহেবকে বললেন যে তারা আর আদালতে যাবেন না। কারণ তিনি জানতেন - তাঁর শেষ পরিণতি। তাঁর ভাগ্য মৃত্যুই লিখে রেখেছে। এরপর একদিন আদালত থেকে ভগৎ সিং - এর ফাঁসির আদেশ এল। সারা পরাধীন ভারতবর্ষ জুড়ে শোরগোল পড়ে গেল। ফাঁসি দেওয়ার তারিখ ঠিক করা হয়েছিল ২৩শে মার্চ (১৯৩১)। তবে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেছিল যে ভগৎ সিং - এর ফাঁসি দেখার জন্য কোটি কোটি মানুষের ভিড় জেলের বাইরে জমায়েত হবে। তাই তারা পরিকল্পনা মাফিক ভগৎ সিংকে একদিন আগে ফাঁসি দেবে বলে ঠিক করে। এরপর একটার পর একটা দিন গুনতে গুনতে তারিখ চলে আসে ২৩শে মার্চ। তখন ভগৎ সিং বই পড়ছিলেন কারাগারের ভিতরে। এমন সময় ইংরেজ সৈন্যদের দুজন ভগৎ সিংকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে। তবে ভগৎ সিং - এর মনে এতটুকুও প্রশ্ন জাগেনি যে তাকে একদিন আগে কেন ফাঁসি দেওয়া হবে? বইয়ের একটিমাত্র পাতা বাকি থেকে গিয়েছিল পড়তে। ভগৎ সিং তাদের (ইংরেজ সৈন্য) জিজ্ঞাসা করে পড়ে নেব? তারা বলে 'না'। ভগৎ সিং বলেন - 'ঠিক আছে - পড়ে নেব কোনো এক সময়।' তিনি উঠে পড়েন এবং ইংরেজ সৈন্যরা তাকে ফাঁসির দোরগোড়ায় নিয়ে যায়। ভগৎ সিং যে কক্ষে ছিলেন সেখানে তিনি লিখে রেখেছিলেন -

"স্বাধীনতার সূর্য আমি দেখতে পাব না জানি
তবে, হে আগামী প্রজন্ম তোমাদের সেই সূর্য আমি দেখিয়ে যাব।"

অতঃপর তাঁকে যখন ফাঁসি দেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল তখন তিনি জোর দিয়ে স্লোগান দিচ্ছিলেন - 'ভারতমাতা কি জয়'। ২৩শে মার্চ ১৯৩১ সাল ঠিক সন্ধ্যা ৭ঃ৩০ টার সময় লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ভগৎ সিং তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সাথে আরও দুইজন মহান বীর বিপ্লবী শিবরাম রাজেন্দর এবং শুকদেব কে ফাঁসি দেওয়া হয়। ভগৎ সিং তাঁর অদম্য সাহস এবং বীরত্বের মাধ্যমে যে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন তা এক কথায় অসামান্য। যার ফলে আমরা এখন স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ।

বাঙালির জীবনে নিতাই গৌররের অবদান

"ঘরের ছেলে চোক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া
বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া"

—কৃষ্ণ কান্তি হালদার (শিক্ষাকর্মী)

আজ বাঙালির বড় সৌভাগ্য আজ থেকে কয়েক বৎসর আগে কলির পাবন অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রভু নিত্যানন্দ যেদিন অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাঙালি গবেষকরা বলেছেন সেদিন বাঙালির নবজাগরণ হয়েছিল। এটা যোড়শ শতকের নবজাগরণ। এই নবজাগরনের ধাক্কা প্রায় ষোলো, সতেরো, আঠারো তিনশত বৎসর ধরে চলেছিল। বাঙালি জাতির যা কিছু উন্নতি হয়েছিল মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের হাত ধরে। কিন্তু আজ আমরা মহাপ্রভুকে ভগবান বলে সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছি। কিন্তু তাদের অসাধারণ পুরুষ হিসাবে ব্যাখা করিনি। তারা কত বড় মহামানব ছিলেন সেই সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আমরা সিনেমায় একটা কথা প্রায় শুনি 'সমাজকো বদল ভালো' কিন্তু সমাজ বদলানো যে কত মুশকিল, কত বড় ধাক্কা সহ্য করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা ভাবি না। খালি জয় গৌর জয় নিতাই বলে নাচানাচি করি। আবার কোনো ব্যক্তি যদি বৃন্দাবন থেকে ভাগ্যবশে ঘুরে আসে 'জয় রাধে, জয় রাধে, করতে থাকে'। কিন্তু এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের প্রকৃত তত্ত্ব কি জানিয়েছেন আমাদের নিতাই গৌর।

বাসুদেব ঘোষের পদাবলি-

"যদি গৌর না হইত কেমনে হইত কেমনে ধরিতাম দেহ
শ্রীরাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে?
বৃন্দাবন বিপিন মাধুরি প্রবেশ চাতুরি সার
বরজ মুখতি ভাবের ভকতি সকতি হইত কার
তাই গাওগাও পুনঃ শ্রীগৌরাঙ্গের গুন সরল করিয়া মন
এ ভব সংসারে এমন দয়াল নাহি হবে কোনোজন।

আমরা আজ থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে যাদের পেয়েছিলাম সেদিন সমগ্র বাঙালি জাতির কপালে সৌভাগ্যের তিলক জ্বলে উঠেছিল। দুই প্রভু আমাদের জীবনকে বদলে দিয়েছিলেন। এই বাংলা ভাষাকে ফুটিয়ে তুলে ছিলেন। এই দুজন মহাপুরুষ আমাদের জাতির ঐতিহ্য। তাঁরা মানুষের মধ্যে ভগবতপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিলেন। ঘুন ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলেন। শুধু ইঁটের উপর ইঁট বা পাথেরের উপর পাথর সাজিয়ে অট্টালিকা তৈরী হয় না। তাদের একত্রে দৃঢ় বাঁধনে বাঁধতে সিমেন্ট বা মশলার প্রয়োজন। সেরূপ মানব হৃদয়ের সাথে মানব হৃদয়ের বন্ধনে শুধু প্রেমের প্রয়োজন। সেই প্রেম তাঁরা দান করেছেন। তারা আমাদের সমাজে এসেছিলেন খেয়েছেন দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখ বহন করেছেন আমাদের সঙ্গে নেচেছেন গেয়েছেন। আমাদের জন্য কত হাহাকার করেছেন, এগুলি আমরা কিন্তু কেউ চিন্তা করি না। মহাপ্রভুর সঙ্গে আমরা যে কাব্যের উপমা দিই না কেন তাকে প্রকাশ করা যাবে না। তিনি নিরুপম ব্যক্তিত্ব। এই শব্দগুলি শুধুমাত্র তারই পাশে লাগে। কিন্তু আমরা কিছু উপলব্ধি করতে পারি না দুই ভাইয়ের সমাজের প্রতি অবদান কত। চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন-

দুই ভাই হৃদয়ের খালি অন্ধকার।
দুই ভাগবতের সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার।।
এক ভাগবত পরম ভাগবত শাস্ত্র।
দুই ভাগবত পরম ভক্তি রস পাত্র।।

এখন যে ভাগবত আমরা পড়ি সেটি নিতাই গৌর প্রচার করেছিলেন। তার আগে আমরা ভাগবত চিনতাম না। এই বাঙালি জাতিটাতো এককালে ভূতপ্রেতের উপাসনা করত। এই জাতিটা ময়লা আবর্জনার মধ্যে পেয়েছিল। সেখান থেকে তুলে সমাজের সর্বোচ্চ আসনে ঠাঁই দিয়েছেন আমাদের নিতাই-গৌর। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ না হলে বাংলা ভাষায় তৈরী হত না। আমরা রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রকে পেতাম না। আমাদের সাহিত্যই তৈরী হত না। এটাই তাঁর সবথেকে বড় অবদান। আজ আমরা বেঁচে আছি মহাপ্রভু, নিত্যানন্দের কৃপায়। তাঁরা যদি না আসতেন আমরা হয়তো অন্য কোনো জাতিতে পরিণত হতাম। একটা বাস্তব সত্যকথা এখানে বলতেই হয়, আমাদের ভারতবর্ষে যেসব মুসলমানরা আছে তাঁরা কিন্তু আরব, ইরান, ইরাক, তুরস্ক থেকে আসা মুসলমান নয় এরা সব ধর্মতাড়িত হিন্দু। এরা সব ৬০০, ৭০০, ৮০০ বৎসর আগে উচ্চবর্ণের চাপে ধর্মপরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। তখনকার ব্রাহ্মণরা ভালো ভদ্রলোক ছিলেন না। 'সর্বং খলিদং ব্রহ্ম' বলে মন্ত্র আওড়াতেন কিন্তু নীচু জাতির ছায়া স্পর্শ করতেন না। তাই নীচু জাতির লোকরা ধর্মপরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। তখন গঙ্গার তীরে থাকত সতীঘাট। আশি বৎসরের বৃদ্ধের সাথে বারো বৎসরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হত। এটাই ছিল আমাদের সমাজ। রাজা রামমোহন রায় যদি এই প্রথার বিরুদ্ধাচারণ না করতেন, যদি আইন না হত, কত নিরীহ মেয়েরা পুড়ে মারা যেত তার ঠিক নেই। তখন একটা প্রবাদ ছিল—

"পুড়বে নারী উড়বে ছাই
তবেই নারীর গুন গাই।"

একটা ষোলো বৎসরের মেয়ে বিধবা হয়ে গেলে তাকে সন্ন্যাসীনির মতো জীবনযাপন করতে হত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যদি না আসতেন, এ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াতেন, ভাবুন কি অবস্থা হত।

কিন্তু আজকের সমাজ অনেক মুক্ত। চিন্তা করতে হবে আমরা কোথায় ছিলাম। এখনো গঙ্গার তীরে অনেক সতীঘাটের নিদর্শন পাওয়া যায়। মানে স্বামীর সঙ্গে যে পুড়ে মরবে সে বড়ো সতী না তাকে পুড়িয়ে মারা হবে চিন্তা করলে চোখে জল আসে। এই সমাজকে পরিবর্তন করা যে কত কঠিন, কত বড় ঝড় সহ্য করতে হয় চিন্তা করুন। তারা এসেছিলেন বলেই আজ বাংলায় জাতিবাদ অনেকটা কম বাকি রাজ্যের থেকে। যদি দুই প্রভু না আসতেন শিক্ষার প্রসারতা হত না। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের কৃপায় আমরা নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছি। তারা যুগঅবতার। বাংলা ভাষায় প্রথম রচিত জীবনীগ্রন্থ বৃন্দাবন দাস-এর 'চৈতন্য ভাগবত'। তার আগে সমস্ত গ্রন্থ ছিল সংস্কৃত ভাষায়। যারা 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ আস্বাদন করেছেন মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলা মহাপ্রভু কিন্তু গীতা ভাগবত শুনছেন না—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতী রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ মনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ

মহাপ্রভু পাঁচখানি গ্রন্থ আস্বাদন করেছেন গীতা ভাগবত নয় এসব অন্য জগতের গ্রন্থ। চণ্ডীদাসের পদ, বিদ্যাপতির পদ, বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক। অসাধারণ সব সাহিত্য। মহাপ্রভু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সাহিত্য যদি বুঝতে হয় এইসব গ্রন্থগুলি পড়ে দেখুন। কিন্তু আজ আমরা সব হারিয়ে ফেলছি। নিজের সংস্কার ভুলে যাচ্ছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া আমাদেরকে গ্রাস করতে বসেছে। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের আদর্শ নিতে পারছি না। একটা জাতি কখন হারিয়ে যায় যানেন? -যখন সে নিজের সংস্কার ভুলে যায়। হয়তো চল্লিশ বৎসর পর বাঙালি জাতিটা আর সেই জায়গায় থাকবে না। হয়তো অন্য কোনো জাতিতে পরিণত হবে। তাই আমরা যেন নিতাই গৌরের আবদানকে ভুলে না যাই এই আমার অনুরোধ। আমি আর বেশি কিছু লিখছি না। লিখতে গেলে প্রসঙ্গ অনেক বড়ো হয়ে যাবে। আমার এই প্রসঙ্গ মধ্যে কোনো ধর্মকে বড়ো বা ছোটো করার উদ্দেশ্য নেই। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আমি সকলের কাছে ক্ষমাপ্রর্থী।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্নিকন্যা বীনা দাস

প্রিতমা দাস, ইতিহাস বিভাগ (২য় সেমিষ্টার)

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ ১৫ই আগষ্ট আমাদের ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল। একজন ভাতবাসী হিসাবে আমরা সকলেই এই দিনটার মাহাত্ম্য জানি। আমরা জানি, কীভাবে বিপ্লবীরা তথা দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা এনেদিয়েছিল। এই সকল দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে পর্যন্ত পিছুপা হয় নি। ভারতের এই বীর সন্তানদের মধ্যে রয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, মহাত্মা গান্ধী, জহরওলাল নেহেরু, ভগত সিং, বিনয়-বাদল-দিনেশ, মাস্টারদা সূর্য সেন প্রমুখরা জীবনের শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কঠোর লড়াই করেছিলেন ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে।

ভারত মাতার পুত্র সন্তানরা যেমন তাঁকে স্বাধীন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, ঠিক তেমন-ই তাঁকে স্বাধীন করার জন্য তাঁকে স্বাধীন করার জন্য তাঁর কন্যা সন্তানরা তথা ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাঈ, প্রীতিলতা প্রমুখ সাহসী কন্যারাও পিছিয়ে ছিলেন না। পুরুষদের পাশাপাশি নারী শক্তিদের ও আত্মত্যাগ ছিল অনস্বীকার্য।

এই সকল নারী শক্তিগুলির মধ্যে ভারত মাতার সাহসী কন্যা ছিলেন বীনা দাস, দেশকে স্বাধীন করার জন্য যে আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন তা সম্পর্কে আমরা একটি ধারনা লাভ করব।

বীনা দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯১১ সালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। যদিও তাদের আদি বাড়ি ছিল চট্টগ্রামের সরোয়াতলী গ্রামে। বীনা দাসের মাতার নাম ছিল সরলা দাস ও তাঁর পিতা ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজী পন্ডিত ও দেশ প্রেমিক বেনীমাধব দাস। হ্যাঁ ইনি হলেন সেই বেনী মাধব দাস যিনি কটকের র‍্যাভেনথ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনিই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মনে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেছিলেন। বেনী মাধব দাসের সাহসী কন্যা কখনোই অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। তাঁর পরিবার ছিল রাজনৈতিক পরিবার। তাঁর দিদি ছিলেন বিপ্লবী কল্যানী দাস এবং তাঁর দাদা অসহযোগ ও জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কারণে কারা বন্ধ হন।

অগ্নিকন্যা বীনা দাস ছোট থেকেই নিজের সাহসিকতা দেখিয়েছেন। তিনি যখন কলকাতার বেথুন স্কুলে পড়তেন তখন স্কুলের বড়লাট পত্নীকে সংবর্দ্ধনা দিতে হবে জেনে বালিকা বীনার মন বিদ্রোহ করে ওঠে, তিনি এই সংবর্ধনা দিতে নাকচ করেদেন। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবি' উপন্যাস। ঘটনাচক্রে সে বছর-ই ম্যাট্রিক পরিক্ষাতে ইংরেজিতে রচনা আসে নিজের প্রিয় উপন্যাস সম্পর্কে লেখার জন্য। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি লেখেন নিষিদ্ধ উপন্যাস 'পথের দাবী' সম্পর্কে। এই কারণে তাঁকে ম্যাট্রিকে উত্তীর্ণ না করানো হলে তিনি বলেন----

"আমরা প্রাপ্য নম্বর আমি ভারতমাতার
স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে অঞ্জলী দিলাম।
এইটাই আমার প্রথম অর্ঘ্য।"

অবশ্য পরের বছর ম্যাট্রিক পাশ করেন বীনা দেবী। এরপর তিনি ভর্তি হন বেথুন কলেজে। কলেজে পড়া কালীন সময়ে অর্থাৎ ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনৈতিক মনস্ক হয়ে ওঠেন। সে সময় যুগান্তর দলের কিছু সদস্যের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন তিনি। তিনি যখন কলেজ ষ্ট্রিটের সামনে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন পুলিশ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে হুংকার দিলেন, তিনি বলেছিলেন--

“Break the cordon, if you must...
but be sure, over our dead bodies.”

১৯৩১ সালে বীনা বি.এ. পরীক্ষায় বসেন এবং স্বসম্মানে উত্তীর্ণ হন পরীক্ষাটিতে। ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে গর্ভনর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করে মারার পরিকল্পনা করেন তিনি। কারণ গর্ভনর ব্রিটিশ শাসনের ‘সুপ্রিম সিম্বল’। তাই তিনি ওই দিন গর্ভনর জ্যাকসনকে উদ্দেশ্য করে পাঁচটি গুলি চালান। যেহেতু জ্যাকসন একজন খেলোয়াড় ছিলেন তাই তার স্বতঃস্ফূর্ত গতির জন্য তিনি ওখান থেকে সরে যান এবং বীনার ছোরা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। জ্যাকসনের দেহরক্ষীতরা ওখানে থাকায় খুব সহজেই বীনা ধরা পড়ে যায়। স্পেশাল ট্রাইবুনালে একদিনে বিচার শেষ করে তাঁর নয় বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। কারাগারে থাকার সময় তাকে বহু অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে সাত বছর জেলখাটার পর ‘গান্ধীজীর প্রচেষ্ঠা’ আন্দামানের সেলুলার জেলে না পাঠানোর জন্য লেডি জ্যাকসনকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম পাঠানোর ফলে ছাড়া পান।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি আবার তিন বছর জেল খাটেন। এরপর তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীশ ভৌমিক কে বিয়ে করেন। ১৯৪৬-১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন। নোয়াখালির দাঙ্গার পরে সেখানে তিনি রিলিফের কাজ করতেন। তিনি স্বাধীনতার পরেও সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। মরিচঝাঁপি গণহত্যার সময়ও তিনি প্রতিবাদী হন।

১৯৬২ সালে যোধপুর পার্ক গালর্স স্কুলে তিনি ইংরেজীর শিক্ষিকা হিসাবে যোগদান করেন, যেখানে তিনি তিন বৎসর শিক্ষকতা করেছিলেন। এরপর ১৯৬৫ - ১৯৭৬ সালে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত তিনি কালিগঞ্জ আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তনে শিক্ষিকা রূপে কর্মরত থাকেন। শিক্ষাকতা করে যে অর্থ তিনি উপার্জন করেছিলেন তার অর্ধেকাংশই তিনি ব্যয় করেছিলেন বিভিন্ন সেবামূলক কাজে।

বীনা দাসের শেষ জীবন ছিল খুবই বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। তিনি শিক্ষাকতার পেশা থেকে অবসর গ্রহনের পর পেনশনের জন্য আবেদন করলেন কিন্তু তাঁর আবেদনের উত্তরে শিক্ষা দপ্তর জানিয়ে দিল, যেহেতু তাঁর গ্রাজুয়েশনের সার্টিফিকেট নেই তাই তাঁর পেনশন অনুমোদন করা সম্ভব হচ্ছে না। সত্যি কি আশ্চর্য ঘটনা, যে বীনা দেবী আমাদের স্বাধীন করার জন্য নিজের গ্রাজুয়েসন সার্টিফিকেট না নিয়ে জ্যাকশনকে গুলি করার চেষ্টার অপরাধে সাত বছর জেল খাটালেন, তাঁকে শেষ জীবনে এই রকম উত্তর পেতে হল।

এরপর শেষ জীবনে পেনশন পাওয়ার আশাতে অফিসে যাওয়া আসা করে কেটে গেল বহু বছর, কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না। দেখতে দেখতে ১৯৮৬ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি হরিদ্বার চলে যান। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ঋষিকেশে অসহায় সম্বলহীন হয়ে পথ প্রান্তে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

নিজের বিপ্লবী জীবনের কথা বীনা দাস লিপি বদ্ধ করে গিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনী ‘শৃঙ্খল ঝঙ্কার’ বইতে।

অবশ্য, আর একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেলাম, বেঁচে থাকা কালীন নিজের গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট তিনি হাতে পাননি। অবশেষে ২০১২ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই বাজেয়াপ্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। যদিও তাঁর পরিবার থেকে সেটা নেওয়ার জন্য কেউই উপস্থিত ছিলেন না।

যে দেশের মানুষের স্বাধীনতায় জন্য তিনি প্রাণ দিতে পিছুপা হননি, সেই দেশের মানুষ তাঁকে কী প্রতিদানই বা দিল স্বাধীনতার পর।

তাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিকন্যা বীনা দাস এবং যে সমস্ত দেশপ্রমিক নিজেদের প্রাণ দিতে পিছুপা হননি, সেই সমস্ত বীর সন্তানদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

The Glorious World

Sunita Mondal, English (5th Semester)

The world is a place of wonder with pleasing and mesmerizing scenary. The world is surrounded by nature. The beautious form of nature makes the world extremely enchanting. The natural world is an incredible wonder that inspires us from the core of our hearts. The greenary of nature not only giving environmental benefits but also creates the world charming. It contains the power of soothing our eyes and heart. Nature helps in maintaing food chain balance on which the world entirely depends on. We live in the lap of the nature and that motivates us on overcoming the depressing situation. The river makes the world more pleasant. The flowing river looks like a silver ribbon and provides the vibe of continuity and livelihood the melody songs of world is flowing through the stream. The mountains are really very refreshing and landscape that bestows the world a magnificient look. The sound of chirping birds, of flowing stream, of dropping rain provides the world a mesmerizing place to have life. The incredible beauty of meadow grass gives the world unparalleled glory. Beauty of nature is unique and this can be found everywhere.

ইতিহাসের আলোকে তেহট্টের কৃষ্ণরায় জীউ মন্দির

পার্থ শর্মা, ইতিহাস বিভাগ (৩য় সেমিষ্টার)

নদীয়া জেলার জলঙ্গী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত একটি গ্রাম হল তেহট্ট। তেহট্টের প্রচীন নাম ছিল ত্রিহট্ট। শোনা যায় যে আগে তেহট্ট গ্রামে তিনজায়গায় সপ্তাহে দুবার হাট বসত তাই এই জায়গাটির নামকরণ ত্রিহট্ট করা হয়েছিল। পরে তা পরিবর্তিত হয়ে তেহট্ট নাম হয়েছে। নদীয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় নানারকম প্রচীন মন্দিরের স্থান। সেরকমই নদীয়া জেলার এই তেহট্ট গ্রামে অবস্থিত একটি প্রাচিন ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান বা মন্দির হল শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায় জীউ মন্দির। এই মন্দিরের সঠিক অবস্থান হল তেহট্ট জীতপুর বাজারের জলঙ্গী নদী থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত ঠাকুর পাড়াতে। তেহট্টের এই কৃষ্ণরায় মন্দিরটি বাংলার নিজস্ব শিল্পরীতি জোড়বাংলো রীতিতে তৈরী। এই ধরনের মন্দির মূলত টেরাকোটা শিল্প দিয়ে তৈরি হয়। এই জোড়বাংলো রীতির বৈশিষ্ট হল যে এই মন্দির গুলিতে দুটি চালা থাকে। একটি চালা বারান্দা হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং আরেকটি চালা গর্ভগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং যেখানে ঠাকুরে বিগ্রহটি বিরাজ করে। মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে অবস্থিত প্রতিষ্ঠা ফলক অনুসারে মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৬০০ শকাব্দ বা ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। পোড়ামাটির হরফে এবং সংস্কৃত লিপিতে লিখিত প্রতিষ্ঠা ফলক থেকে জানা যায় যে, ১৬০০ শকাব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মসেবী মহানপুরুষ শ্রী রামদেব মাহান্ত এই মন্দির নির্মান করেন। এই মন্দিরটি বীরভূমের মল্লরায় রাজাদের আমলের মন্দির। এই মন্দিরে ভগবান শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায়জী রাধিকাবিহীন ভাবে বিরাজ করেন। শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায় ঠাকুরের বিগ্রহটি কষ্টিপাথরের তৈরি।

শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায়জীর রাধিকা না থাকায় বেশ কিছু কিংবন্তি প্রচলিত আছে-শোনা যায় যে রামদেব ও তার কন্যা লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণরায়ের সেবা করতেন। লক্ষ্মীদেবী ঠাকুরের বিগ্রহ সেবা করতে করতে হঠাৎ একদিন অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েন, তখন স্থানীয় মানুষজন তাকে কলঙ্ক দিতে থাকলে তিনি মন্দিরের পিছনের পুকুরে গিয়ে দেহত্যাগ করেন। তারপর লক্ষ্মীদেবী তার পিতা রামদেবকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানান যে গ্রামের মানুষ তাকে কলঙ্ক দিতে থাকায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছেন। আর তিনিই ছিলেন স্বয়ং রাধিকা। তাই তিনি রাই ভাবে কৃষ্ণরায়কে সেবা করছিলেন। কিছুদিন পর গ্রামের রাস্তা দিয়ে একজন শাঁখা বিক্রেতা আসছিলেন, তখন নাকি লক্ষ্মীদেবী তাকে দেখা দিয়ে তার হাত থেকে শাঁখা পড়তে চান, তখন শাঁখা বিক্রেতা তাকে জানান তিনি তখন পুকুরে স্নান করতে এসেছেন তাহলে তাকে কীভাবে শাঁখা পরাবেন? এর উত্তরে লক্ষ্মীদেবী শাঁখা বিক্রেতাকে বলেন যে, পাশের মন্দিরেই তার বাবা রয়েছেন এবং তিনি তাকে মন্দিরের কুলঙ্গি থেকে টাকা দিয়ে দেবেন শাঁখার দাম বাবদ। যথারতি এই শাঁখা বিক্রেতা লক্ষ্মীদেবীকে শাঁখা পরিয়ে তার বাবার কাছে এসে সমস্ত ঘটনা জানান এবং তারপর রামদেব তাকে বলেন যে, বর্তমানে তার মেয়ে আর জীবিত নেই। তখন রামদেবকে সঙ্গে করে ওই শাঁখা বিক্রতা পুকুড়ে পারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে সেখানে কেউ নেই। এই সমস্ত ঘটনা দেখে তাকে পাগল আখ্যা দিয়ে কিছু মানুষ মারতে উদ্ধত হলে তখন লক্ষ্মীদেবী তার হাত তুলে তার শাঁখাজোড়া দেখিয়েছিলেন।

তখন গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করতে থাকেন যে উনি স্বয়ং রাধা ছিলেন যিনি রাই ভাবে কৃষ্ণরায়ের সেবা দিতেন। এরকমই অনেক কিংবদন্তি শোনা যায় মানুষের মুখে। তবে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা আজ তা বিতর্কের বিষয়।

শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায়দেবের মন্দিরে বছরে অনেক উৎসব হয়ে থাকে যেমন-স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, পুণ্যযাত্রা, ঝুলন পূর্নিমা, জন্মাষ্টমী, অন্নকূট, নবান্ন, মাঘীপূর্নিমা মহোৎসব। এই উংসবে ২৪ প্রহর ব্যাপী নামসংকীর্তন চলে ও শেষের দিন অর্থাং মালসাভোগের দিন অজস্র মানুষ এখানে খিচুরি প্রসাদ খেতে আসেন। এছাড়া দোলপূর্ণিমা কথকথা পর্ব ইত্যাদি হয়ে থাকে।

প্রতিদিনের পূজার মধ্যে থাকে মঙ্গলারতী,ঠাকুর জাগরণ উপলভোগ,মধ্যাহ্নভোগ,ধর্মগ্রন্থ পাঠ,হরিনাম সহ সন্ধ্যারতি ও শীতল ভোগ নিবেদনের পর ঠাকুরের শয়ন।

আজ তেহট্টবাসীর কাছে এটি গর্বের বিষয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরায়জী আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন এবং সকল ভক্তমন্ডলীর মনবাসনা পূরণ করছেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।

সমাজে নারীদের সমস্যা

সৌমি বর্মন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (১ম সেমিষ্টার)

ভারত এমন একটি দেশ যেখানে নারীদের দেবীর মর্যদা দেওয়া হয়। একদিকে তারা নারীদের দেবী রুপে পূজা করে, অন্যদিকে তাদের সীমাহীন গালিগালজ করে এবং তাদের নিকৃষ্ট মনে করে। ভারতীয় নারীদের সবসময় সমাজে কোন না কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মানুষ বিবর্তিত এবং সমস্যাগুলিও হয়েছে,আমাদের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করতে হবে এবং আমাদের দেশের উন্নতিতে সহায়তা করার জন্য দ্রুত কাজ করতে হবে। যখন প্রথম দিকে সতীদাহ প্রথা, বিধবা পুনবিবাহ না, দেবদাসী প্রথা ইত্যাদির মতো গুরুতর সমস্যা ছিল। যদিও তাদের বেশিরভাগ এখন প্রচলিত নয়, সেখানে নতুন সমস্যা রয়েছে যা নারীদের মুখোমুখি হয়। তারা একটি দেশের উন্নতিতে বাধাগ্রস্ত করে এবং নরীদের হীন মনে করে। মহিলাদের বিরুদ্ধে সংহিতা একটা অত্যন্ত সমস্যা যা ভারতের নারীদের মুখোমুখি হতে হয়। এটি প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন রুপে ঘটছে। লোকেরা এটা প্রতিবাদ করার পরিবর্তে এটির দিকে খারাপ দৃষ্টি দেয়। এছাড়াও যৌতুক সংক্রান্ত হয়রানি, বৈবাহিক ধর্ষন, যৌনাঙ্গ কেটে ফলা এবং আর অনেক কিছু রয়েছে। আমাদের লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়গুলিও রয়েছে। নারীদেরকে পুরুষের সমান মনে করা হয় না। বাড়িতে হোক কিংবা কর্মক্ষেত্রে হোক তারা প্রায় সব জয়গায় বৈষম্যের সম্মুখীন হয়। এমনকি ছোট মেয়েরাও বৈষম্যের শিকার হয়। পুরুষতন্ত্র একজন নারীর জীবনকে অন্যায়ভাবে নির্দেশ করে। তাছাড়া নারীদের শিক্ষার অভাব গ্রামাঞ্চলের নারীরা নারী হওয়ার কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়। নারীদেরকে বাড়িতে আটকে রাখা হয় এবং খুব অল্প বয়েসে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। যা বাল্যবিবাহ নামে প্রচলিত। গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহপ্রথা আজও প্রচলিত। কোন সময় নারীরা কর্মক্ষেত্রে কর্ম করার সুযোগ পেলেও একইভাবে এই একই কাজ করার জন্য নারীরাও পুরুষের সমান বেতন পান না। তার উপরে, তারা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা ও শোষনের সম্মুখিন হয়। এছাড়াও রাস্তাঘাটে নারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হয়। মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। আর একজন মা-ই হচ্ছেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক। লক্ষ লক্ষ নারী এখনও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ফলে সন্তানের প্রথম শিক্ষকই থেকে যাচ্ছে শিক্ষার অন্তরালে। সন্তান শিক্ষিত না হলে স্বাভাবিক ভাবেই জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কেননা আজকের শিশুরা হবে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ফলে নারী শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন। ভারতের নারীরা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছে তার বিরুদ্ধেলড়াই করার জন্য আমাদের সকলকে একত্রিত হতে হবে। সমাজের প্রত্যেক নাগরিক এবং সরকারকে অবশ্যই এটিকে নারীদের জন্য নিরাপদ স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যারা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ করে তাদের আরও কঠোর আইন করতে হবে। পুরুষের চেয়ে নারী নিম্ন চেতনা সম্পন্ন আমাদের সমাজে এরকম একটা ধরনা আছে। আমাদের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত। কিন্তু নানান কৌশলে আমাদের সমাজে সম্পত্তি, শিক্ষা ও রাজনীতির অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। আমাদের সমাজ এর বিশ্বাস পুরুষ পরিচালিত হয় যুক্তির দ্বারা এবং নারী পরিচালিত হয় আবেগের দ্বারা আমাদের সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতকা সামাজিক,রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক তথা অনান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীকে অবদমিত করে রেখেছে আর এইঅবদমিতর কারণেই বর্তমান সমাজে নারী জীবনে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সমাজে নারী জীবনের প্রধান সমস্যা হল আত্মবিকাশের সমস্যা। নারীরা একটু সচেষ্ট হলেই এবং প্রযোজনানুযায়ী বিদ্যাবুদ্ধি ও চিন্তার প্রয়োগ করতে পারলেই নিজের সম্মান ও স্বাধীনতা উভয়ই' অর্জন করতে পারবে। নারীদের নিজের অধিকার রক্ষায় সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। নারী ও পুরুষের মিলিত প্রচেষ্টা বর্তমান সমাজে নানা সমস্যা দূরীভূত হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলার উৎসব

অসীমা দাস, কলা বিভাগ (৩য় সেমিষ্টার)

ভূমিকা ঃ

বাংলার মাটি,বাংলার হাওয়া
বাংলার ভাষা, বাংলার গান
বাংলার উৎসবে যেন মেতে ওঠে
বাঙালির প্রাণ”

মানব হৃদয় আনন্দ পিপাসু, রবি ঠাকুর তাঁর গানের লাইনে লিখেছেন ‘‘আনন্দধারা বহিছে ভুবনে” সেই আনন্দধারায় আমরা বাঙ্গালিরা আজও গা ভাসিয়ে আছি। ‘উংসব’ শব্দটি শুনলেই যেন মনে হয় কোথা থেকে এক আকাশ আনন্দ সিক্ত মেঘ হৃদয় আকাশে তার ইচ্ছা ডানা বিস্তার করে ঋতুর বনময় আত্ম প্রকাশের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালির ধর্মীয় সামাজীক ও সংস্কৃতিক জীবনে অনেক উৎসব আসে। বৈশাখের প্রথম দিন থেকে চৈত্রর শেষদিন প্রর্যন্ত উৎসবের ঘনঘটায় বাঙ্গালির ‘‘বার মাসে তের পাবর্ন” উৎসবের মধ্যে দিয়ে মানুষতার জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মিলনের বৃহত্তর ক্ষে ত্রে উত্তীর্ণ হয়। প্রতিদিনের কর্ম ব্যস্ততা মানুষের জীবনকে করে তোলে ক্লান্ত-শ্রান্ত বিচিত্র্যহীন এই কর্ম-ব্যস্ত জীবনে মানুষ একটু আনন্দ একটু স্বস্তি চায় বিভিন্ন উৎসব মানব জীবনে এই আনন্দের বানী নিয়ে আসে, উৎসব তাই মিলনের সুখ প্রাণের আনন্দের অভিব্যক্তি।

উৎসব কি ঃ উৎসব মানে আনন্দ উচ্ছ্বাস ভেদাভেদ নয়,
‘উৎসব মানে বিবেক প্রীতি প্রেম উৎসব মানে মানুষ্যত্ববোধের জাগরণ’

প্রাণশক্তির বিচিত্র্যময় অভিব্যক্তি অর্থাৎ উৎসব বলতে সামাজীক ধর্মীয় এবং ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপটে পালিত আনন্দ অনুষ্ঠানকে বোঝায় উৎসবের মাধ্যমে আমরা আনন্দ প্রকাশ এবং আনন্দ লাভ করে থাকি তবে এ আনন্দ একার নয় পারিবারিক সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক পরিমন্ডলে সকলের সম্মিলনের সুখ লাভের উপায় হল উৎসব।

উৎসবের প্রয়োজনীয়তা ঃ আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার সুখে সকলের সুখ হউক,আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিয়া উপভোগ করি। ‘‘ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ” মানব সমাজের উৎসবের মূল লক্ষ্য হল, মানুষের সঙ্গে মানুষের আনন্দময় আত্মিক মিলন উৎসব মানব জীবনকে পূণ্যতা দেয় সংকীর্ণতা দূর করে। মূল্যবোধের প্রসার ঘটায় তার মধ্যে মানুষ্যত্বের চেতনাকে জাগ্রত করে।

ধর্মীয় উৎসব ঃ বাংলায় ধর্মকেন্দ্রীক উৎসব বেশি যেমন- হিন্দুদের দুর্গাপূজা, কালিপূজা, লক্ষ্মীপূজা। সরস্বতীপূজা বিশেষ জাকজমক ভাবে পালিত হয়। এছাড়াও যেমন-আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মাপূজা।

মুসলমানদের প্রধান উৎসব ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-ফোয়হা এবং মহরম দেশ ব্যাপী উৎসবের পরিবেশ তৈরি করে।

খ্রিষ্টানদের বড়োদিন ও বাঙ্গালির জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

ঋতু উৎসব ঃ বাঙ্গালীর জীবনে এবং সময়ে ঋতু উৎসব গুলির গুরুত্ব প্রধান ছিল। এখন শহরে আদপ কায়দায় বিলুপ্ত প্রায়। তবুও ১লা বৈশাখ এ নবর্ষকে বরণ করে নতুন পোশাক ও ভালো খাওয়া দাওয়া করে। হেমন্তকালে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ধান ওঠার উৎসব নবান্ন এবং পৌষ সংক্রান্তির দিন পৌষ পার্বন। আর বসন্তকালে হোলি। আবির ও রঙের খেলা বসন্তকে অভিনন্দন জানানো হয়।

সাংস্কৃতিক উৎসব ঃ আমাদের দেশের মনীষীদের স্মৃতিতে ও জীবনের উল্লেখযোগ্য দিন গুলি মনে রাখার জন্য এই উৎসব পালন করা হয়। যেমন-১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস। ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্ম জয়ন্তী,পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরী, মিষ্টান্নভোজ এই উৎসবের অঙ্গ। ২৫শে বৈশাখ ও ২২শে শ্রাবন রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু দিবস। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়, রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি পাঠ করা হয়।

উপসংহার ঃ উৎসব মানুষের সামাজিক জীবনের এক ঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেয় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তোলে। উৎসবই মানুষর মন থেকে সমস্ত দুখ কষ্ট সারিয়ে ফেলে আনন্দে আনন্দিত করে তোলে। এছাড়াও পারিবারিক উৎসব সমাজের পাঁচজনের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন-বিবাহ,আন্নপ্রাশন, জন্মদিন, রাখিপূর্ণিমা, জামাইষষ্ঠী, ভাইফোঁটা ইত্যাদি নানাবিধ উৎসবের মাধ্যমে পরিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

মিষ্টি'র লক্ষ্মীবাঈ

প্রতিমা দাস, ইতিহাস বিভাগ (৩য় সেমিস্টার)

''আমরা নারী, আমরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতেও পারি''।

এখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে প্রায়। মিষ্টি একা একাই সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলায় তার মেয়ের ঘরে গিয়ে দরজা ঠেলে দিয়ে এক কোণে চুপটি করে বসে রইল। মিষ্টির বয়স এখন ১২। চরিত্রগত দিক থেকে মিষ্টি খুবই শান্ত প্রকৃতির কিন্তু রেগে গেলে তার রাগ কমানোর কার সাধ্যি নেই। খুব অল্প বয়স থেকে মিষ্টি গল্প শুনতে ভালবাসে। আর সেটা যদি মায়ের শোনানো ঐতিহাসিক চরিত্র হয় তাহলে তো আর কোনো কথা নেই। সাধারণত এই বয়সে বাচ্চারা রাজা রানীর গল্প শুনতে ভালবাসে কিন্তু মিষ্টি একটু অন্যরকম। মিষ্টি এখন রেগে আছে। কেন? কারণ মা বাড়িতে না থাকায় তার আর একা একা দিন কাটছে না। তাই সে রামু কাকাকে একটি গল্প বলতে বলে। কিন্তু রামু কাকার বলা গল্প তার মোটেই পছন্দ হয়নি। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া। এই হাওয়াতে আস্তে আস্তে খুলে গেল। মিষ্টি দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে আনন্দচ্ছ্বাসে বলে উঠলো ''মা তুমি এসেছ''। আলতো স্বরে ময়া ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল ''হ্যাঁ সোনা, আমি এসেছি''। মিষ্টি ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল আর আবদার করে বলল ''একটা গল্প শোনাও না মা,তেমার মতো কেউ গল্প বলতে পারেনা। কতদিন তুমি গল্প শোনাও নি '' এই বলে মিষ্টি জেদ ধরে বসলো। ''আচ্ছা বেশ বেশ'' এই বলে উত্তর আসল। ''তার আগে তুমি চলো বিছানায় চুপটি করে বসো''। এরপর বড় আগ্রহের সঙ্গে মিষ্টি জিজ্ঞাসা করলো। ''আজ তুমি কার গল্প শোনাবে মা''? প্রশ্নোরত্তরে মা বলল।

''ঝাঁসির রানী লক্ষী বাঈ''

''তিনি কে মা? কি করেছিলেন তিনি? তিনি কি খুব....''। মিষ্টির এত জানা র আগ্রহ দেখে হেসে বলল ''আচ্ছা বেশ বেশ

আমি একে একে সব বলছি''। এই বলে তিনি বলা শুরু করতেন—

''আজ আমি যার কথা তোমায় শোনাচ্ছি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এক নারী। স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ অর্থাৎ মহাবিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনিই ছিলেন প্রথম নারী যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছুপা হননি। ১৮২৮ সালের ১৯শে নভেম্বর মারাঠা রাজ্যের বারাণসিতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে পিতা মোরোপন্থ তাম্বে ও মাতা ভাগীরথী দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন লক্ষীবাঈ। ছোটো বেলায় তার নামকরণ করা হয় মনিকর্নিকা কিন্তু সবাই তাঁকে মনু বলে সম্বোধন করত। যখন চার বছর বয়স তখন তাঁর মা পরলোক গমন করেন। ছোট্ট মনুকে নিয়ে তাঁর বাবা বিথুরে চলে যায়, রাজা দ্বিতীয় পেশোয়া বাজীরাও এর আশ্রয়ে। রাজা মনুকে তার ছেলে নানা সাহেবের মতোই ভালবাসতো

ছোট থেকেই অস্ত্রশস্ত্রের দিকে খুব আগ্রহী ছিল মনু। তাই সে তাঁর বন্ধু তাতিয়া তপি ও নানা সাহেবের সাথে তরোয়াল চালানো, ঘোড়া চালানো ও মার্সালাট শিখতো। পরবর্তীকালে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ঝাঁসির রাজা গঙ্গাধর রাও নেওয়াকর এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এরপর মনুর নাম হয় ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈ। বিবাহের কিছুদিন পর তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাত্র চার মাস পর শিশুটির মৃত্যু হয়। পুত্র শোকে গঙ্গাধর রাওয়ের শরীর খারাপ হয়ে পড়লে তারা আনন্দ রাও নামে এক শিশুকে দত্তক নেন এবং নাম রাখেন দামোদর রাও। এর কিছু কাল পরে ১৮৫৩ সালে ২১নভেম্বর গঙ্গাধর রাও মৃত্যু বরণ করেন'' এতদূর পর্যন্ত গল্প শুনে মিষ্টি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল ''গল্প কি শেষ মা'' মায়ের থেকে উত্তর আসে ''গল্প শেষ কেন হবে,

মায়ের থেকে উত্তর আসে ''গল্প শেষ কেন হবে, এবার তো রানীর জীবনের আসল যুদ্ধ শুরু''। ''এরপর কি হয়েছিল মা''? প্রশ্নোত্তরে মা বলে,''১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড ডালহৌসি এক নীতি ঘোষণা করেন। এতে বলা হয়, যে সকল রাজার নিজ পুত্র থাকবে না তাদের রাজ্যগুলি কোম্পানি দখল করে নেবে। যেহেতু রানীর নিজস্ব পুত্র ছিল না তাই কোম্পানি কর্তৃক বার্ষিক মাত্র ৬০ হাজার ভারতীয় রুপি ভাতা হিসাবে মজুদ করা হয় এবং এর বিনিময়ে রাজ্য ছেড়ে দিতে বলা হয়। রানী এই ভাতা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন আমি আমার রাজ্য জীবিত থাকা অবস্থায় কোনোভাবেই তোমাদের দেব না। তাই তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলেন কিন্তু সেই সময় ব্রিটিশদের কাছে উন্নত অস্ত্র থাকার কারণে তারা জিতে যায়। ফলে রানী তার পুত্র দামোদর রাও কে পিঠে বেঁধে নিয়ে ঘোড়ায় বসে তাঁর প্রাসাদের উঁচু প্রাচীর থেকে লাফ দেন। এরপর তাঁর দুই বন্ধু তাতিয়া তোপি ও নানা সাহেবের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গোয়ালিয়র যান এবং তা জয় করেন। কিন্তু এই জয় ছিল ক্ষণিকের। রানীর যুদ্ধ কৌশল ও শক্তি দেখে ইংরেজরা ব্রিটিশ সেনাপতি হিউজ বস কে পাঠান। ফলে হিউজ রসের নেতৃত্বে যুদ্ধ শুরু হয়। দুই হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে অসম্ভব সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করলেও সেই দিন ভাগ্য তাঁর সাথ দেয়নি। রানী সাংঘাতিকভাবে যুদ্ধে আহত হন। ফলস্বরূপ ১৮৫৮ সালের ১৭ই জুন গোয়ালিয়রে মৃত্যুবরণ করেন। ''এই বলে তিনি গল্প শেষ করলেন এবং মিষ্টিকে জিজ্ঞাসা করলেন'' তাহলে মিষ্টি মা কি বুঝলে গল্পটি শুনে''? মিষ্টি উল্টে তার মাকে জিজ্ঞাসা করে ''সেই সময় তিনি কি একমাত্র নারী ছিলেন যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন''। ''হ্যাঁ, তাই তো তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম মহিলা বিপ্লবী নেত্রী হিসেবে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে রয়েছেন। এমন সময় নিচে দরজার বেল বেজে উঠল। কেউ একজন এসেছে মনে হয়। ঘন্টার আওয়াজ শুনে রামু কাকা দরজাটা খোলে এবং কৌতুকের সহিত বলে ''দাদাবাবু উনি কে''? তখন মিষ্টির বাবা বলে ''ইনি হলেন সাইকোলজিস্ট প্রিয়া রায়''। এরপর ডক্টর প্রিয়া বলে,'' আর দেরি না করে এবার পেশেন্টের কাছে নিয়ে চলুন মিস্টার শর্মা''। তারা রামুর দিকে তাকাতেই রামু বলে উপরের ঘরে আছে মিষ্টি। উপরে গিয়ে দেখে মিষ্টি একা একাই কথা বলছে বিছানার উপর বসে। এই দেখে ডক্টর প্রিয়া জিজ্ঞাসা করে ''কবে থেকে এরকমটা হচ্ছে''? প্রশ্নোত্তরে জানাই''আজ থেকে প্রায় ছয় মাস আগে মিষ্টির মা যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়ে যায়। মায়ের মৃত্যু শোক সহ্য করতে না পেরে মিষ্টি আস্তে আস্তে মানসিকভাবে অসুস্থ হতে থাকে। এখন আপনি একমাত্র ভরসা। কিছু একটা করুন, যাতে আবার মিষ্টি আগের অবস্থায় ফিরে আসে'' অনুরোধ করে বলল মিষ্টির বাবা।

''একদম আমি আমার সবটা দিয়ে চেষ্টা করব''।
জীবনযাত্রায় আমরা সকলেই যুদ্ধ করে থেকি।
কেউ দেশের জন্য, কেউ পরিবারের জন্য কেউ অসুখের সাথে,
আবার কেউ কেউ নিজের সাথেই।
তাই জীবনযাত্রায় থেমে না থেকে,
ভয় না করে,যুদ্ধ করে এগিয়ে যাওয়া উচিত।
তাতে এককালে জয় তোমার হবেই।

....

ভগৎ সিং

পার্থ শর্মা, ইতিহাস বিভাগ (২য় সেমিষ্টার)

আমাদের দেশ, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের লড়াই, আমাদের স্বাধীনতা। এই সংগ্রাম, লড়াই, আন্দোলন সমস্ত কিছুই জাগরিত হয় - স্বাধীনতার স্বাদ পেতে। মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে তার স্বাধীনতাটা সে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করতে সচেষ্ট থাকে। অর্থাৎ বেঁচে থাকতে গেলে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতার প্রয়োজন, স্বাধীন হওয়া প্রয়োজন। আর এই স্বাধীনতার জন্যই সে সমাজে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে এবং মুক্ত জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। এই রকমই দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে ভারতমাতার অনেক বীর সন্তান তাদের রক্ত দিয়ে ভারতমাতাকে রক্ষা করেছে। ভারতবাসীকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী আন্দোলন, যুদ্ধ, লড়াই, আত্মত্যাগ করে ভারতবাসীর মুখে স্বাধীনতার হাসি এনে দিয়েছেন অগ্নিযুগের কিছু সাহসী বিপ্লবীরা। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। অসংখ্য কিছু বিপ্লবীর নাম আমরা দেখতে পাই। সেই রক্তক্ষয়ী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের যুদ্ধে। তাদের মধ্যে কিছু জনপ্রিয় ব্যক্তিরা হলেন - নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, মাস্টারদা সূর্যসেন, বিনয় - বাদল - দীনেশ, বটুকেশ্বর দত্ত, চন্দ্রশেখর আজাদ, প্রফুল্ল চাকি এবং একজন উল্লেখযোগ্য বিপ্লবীর নাম হল ভগৎ সিং।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিপ্লবী হলেন ভগৎ সিং। তিনি পাঞ্জাবের এক জাঠ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সর্দার কিষেণ সিং ও মাতা বিদ্যাপতি দেবী। ভগৎ সিং - এর পরিবার ছিল ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত। ভগৎ সিং - এর পিতা এবং কাকা দুজনেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে। এই জন্য ছোটোবেলা থেকেই অর্থাৎ শৈশবকাল থেকেই তার মনে বিপ্লববাদের সূচনা হয়। তার মনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আগুন জ্বলে উঠেছিল। তিনি DAV College থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং লাহোরের ন্যাশনাল কলেজে B.A পড়তে ভর্তি হয়েছিলেন। লাহোরের DAV কলেজে শিক্ষাগ্রহণের সময় তিনি তাঁর দুই শিক্ষক ভাই পরমানন্দ ও জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হন। এরপর তিনি যখন বড়ো হতে লাগলেন সেই সময় গান্ধীজির জনপ্রিয়তা খুব বেড়েছিল। মানুষ গান্ধীজিকে মেনে চলতেন। ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯ সালে ইংরেজরা জালিয়ানওয়ালা বাগের ভিড়ের মধ্যে গুলি চালায়। জালিয়ানওয়ালা বাগের কাণ্ডে বহু মানুষ মারা গিয়েছিলেন। এই কাণ্ডের জন্য গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। মানুষজন সরকারি জিনিসপত্র ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্কুল - কলেজ - অফিস যেতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই সময় ভগৎ সিং - এর মতো বহু যুবক সম্প্রদায় জেগে উঠেছিল। তারা ভাবছিল এবার এমন কিছু করতে হবে যাতে ইংরেজরা দেশ ছেড়ে পালায়। কিন্তু ১৯২২ সালে একটি কৃষক গোষ্ঠী সরগপুর জেলার আওতায় আসা একটি পুলিশ স্টেশনে আগুন জালিয়ে দেয়। এর ফলে অনেক পুলিশ মারা গিয়েছিল। এই ঘটনার পর গান্ধীজি তার অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ভগৎ সিং যখন জানতে পারলেন পারেন যে হান্ধীজি তার অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন তখন তার খুব খারাপ লেগেছিল। তিনি ভাবতে থাকেন যে, অহিংসার পথে চললে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়। এরপর তিনি যখন কলেজে পড়ছিলেন তখন তার সাথে দেখা হয় বিভূতিচরণ বর্মা, শুকদেব থাপর এবং বহু বিপ্লবীদের সাথে। এরপর তিনি ১৯২৩ সালে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দেন এবং নিজ যোগ্যতায় অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে ভগৎ সিং যুবসমাজ 'ভারতসভা' গঠণ করেন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের যুব সমাজের মনে ভারতের স্বাধীনতার আগুন জ্বালানো। তিনি এই সভার মাধ্যমে ভারতের সমস্ত যুবকদের একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং যাদের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হবে কী ভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়ব এবং কীভাবে তাদের কাছ থেকে আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেব। ১৯২৬ সালে লাহোরের একটি বোমা কাণ্ডের ফলে পুলিশ ১৯২৭ সালে তাকে গ্রেফতার করে। তাকে এই মামলায় ৬০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৫ সপ্তাহের সাজা শোনানো হয়েছিল। জেল থেকে বেরোনোর পর তিনি উর্দু ও শিখ সংবাদপত্রের হয়ে লেখা শুরু করেন।

এরপর ১৯২৮ সালে বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ ও অন্যদের সাথে ভগৎ সিং দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলায় হিন্দুস্তান

রিপাবলিকান পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করে এই দলের নতুন রূপ দিয়ে 'হিন্দুস্তান স্যোশালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (HSRA) নামে একটি বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে একটি সমাজতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসেবে স্থাপন করা এবং এই সোশ্যালিস্ট সমাজবাদী ধারা মেনে চলতেন এবং তারা কৃষকদের বিরুদ্ধে হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করতেন।

১৯২৮ সালে ইংরেজরা ভারতে সাইমন কমিশন আইন জারি করেছিল এবং সারা ভারত জুড়ে এই কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। প্রবীন জননেতা লালা লাজপত রায় এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। পুলিশ এই আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ করেছিল এবং সেই লাঠির আঘাতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর তার মৃত্যু হয়। ভগৎ সিং এবং তাঁর অনুগামীরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং পুলিশ আধিকারীক জেমস স্কটকে লালার মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিলেন কারণ স্কটই লাঠি চার্জের আদেশ দিয়েছিলেন। এই জন্য ভগৎ সিং জেমস স্কটকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন কিন্তু চিনতে ভুল হওয়ায় তিনি জন স্যান্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করে ফেলেন। সেই কারণে ভগৎ সিং এবং তার সহযোদ্ধারা লাহোর থেকে পালিয়ে হাওড়ায় চলে এসেছিলেন। ইংরেজ সরকার এরপর 'পাবলিক সেফটি বিল' এবং 'ট্রেড ডিসপুউট' আইন এনেছিলেন। এই বিল পাশের ফলে ভারতে ঘটিত সমস্ত রকমের আন্দোলন বা হরতালকে বেসরকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এর সাথে কোনো কারণ ছাড়াই মানুষকে জেলে বন্দী করার ক্ষমতাও তারা পেয়েছিলেন। সারা দেশ জুড়ে এই আইনের বিরোধীতা হয়েছিল কিন্তু ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত বিরোধীতার উপরে গিয়ে অ্যাসেম্বলিতে বোমাবাজি করেন। বোমাবাজির পরে তারা সেখান থেকে না পালিয়ে নিজেকে পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে দেন। জেলে থেকেও তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। জেলে কয়েদীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হত সেইসময়। ঠিকমতো খাবার ও পোষাক দেওয়া হত না। ভগৎ সিং তখন অন্যান্য বন্দীদেরকে সাথে নিয়ে জেলের ভেতর অনশন করা শুরু করে দিয়েছিলেন। তার এই অনশন দেশজুড়ে সমর্থনযোগ্য হয়েছিল। এই অনশনে সামিল যতীন দাস অনশন করার ৬৪ দিন পর মারা যান। ভগৎ সিং তাঁর অনশন ১১৬ দিন জারি রেখেছিলেন। পরে তাঁর পিতার অনুরোধে অনশন বন্ধ করেন। এরপর ভগৎ সিং - এর বিরুদ্ধে হত্যার মামলা শুরু হয় এবং মামলার নামকরন করা হয় 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'। এই মামলায় ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবকে ফাঁসির সাজা শোনানো হয়েছিল। ২৪শে মার্চ দিনটিতে তাদের ফাঁসির দিন ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের ১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ সন্ধ্যা ৭ টার সময় ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। জেল ওয়ার্ডেন ভগৎ সিংকে বলেন ভগবানকে স্মরণ করো, তখন ভগৎ সিংকে বলেন যে "সারাজীবনে একদিনও আমি ভগবানকে স্মরণ করিনি। আসলে আমি অনেকদিন গরীবদের কষ্টের জন্য ভগবানকে দায়ী করেছি। যদি এখন আমি তার কাছে ক্ষমা চাই তাহলে সে বলবে এর থেকে ভিতু আর হয় না। এর সময় যেহেতু শেষ তাই আমাকে এখন স্মরণ করছে, ক্ষমা চাইছে।" ফাঁসির পরে এই তিন জনের দেহকে জেলের পেছনের দেওয়াল ভেঙে সুতলজ নদীর তীরে অন্তিম সংস্কার করা হয়। ভগৎ সিং বলতেন "তারা আমাকে মেরে ফেলতে পারবেন কিন্তু আমার বিচারকে মেরে ফেলতে পারবেনা।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভগৎ সিং ছিলেন একজন তরুণ বিপ্লবী। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি দেশের জন্য আত্ম বলিদান করেছিলেন। তার এই আত্ম বলিদান আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে। আজও প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে এবং যুব সমাজের কাছে এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হয়ে আছেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক হয়ে। ভগৎ সিং ছোটো থেকে যেমন বিপ্লবের প্রতি আকর্ষিত হন, তেমনি ছোটো থেকেই তিনি বই পড়তে খুব ভালো বাসতেন। তিনি যখন জেলে অনশনে ছিলেন তখনও তিনি অনেক বই নিয়মিত পড়েছেন। এছাড়াও নিয়মিত সংবাদপত্রও দেখা ছিল তার কাজ। তার জন্য তিনি জেলে অনশনের সময় ব্রিটিশ কর্তাদের বলেছেন যে তাকে যেন বই এবং সংবাদপত্র দেওয়া হয়। তাই আমরা এই রকম একজন সাহসী, তেজী, ত্যাগী বিপ্লবীকে সর্বদা মনে রাখবো। ভারতমাতার জন্য যিনি আত্ম বলিদান দিয়েছেন। তার আদর্শ আজও ভারতের যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। 'জয় হিন্দ - বন্দে মাতরম্'।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

অর্পিতা হালদার, ইতিহাস বিভাগ (১ম সেমিষ্টার)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে যাঁর নামটি এক বিশাল জ্যোতিষ্কের মতো চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে তিনি হলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। তৎকালীন একটি ধনী অভিজাত বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সুভাষচন্দ্র বসু সুখকর জীবনের মায়াজাল ত্যাগ করে দেশ ও জাতির সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন -

"পৃথিবীতে এমন কোনো রাত্রি আসে নাই,
যে রাত্রের প্রভাত হয় নাই। দুঃখের
রাত শেষে অবশ্যই প্রভাত হইবে।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বীর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু যে অসামান্য অবদান রেখেছেন তার তুলনা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বলেছেন তাঁর নির্ভিকতা, ত্যাগ, দুঃখবরণ ও আত্মবলিদান ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাকে পৌরাণিক পুরুষের মর্যাদা দান করেছে। বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক কামাখ সুভাষচন্দ্রকে শিবাজী, ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি ও কামাল আতাতুর্কের সাথে তুলনা করেছেন।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গী গান্ধীজি ও তার অনুগামীদের ক্ষুব্ধ করে। গান্ধীজি ত্রিপুরি কংগ্রেসে (১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) সভাপতি হিসাবে পট্টভি সীতারামাইয়ার নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। এতে গান্ধীজি ও তাঁর সমর্থকেরা সুভাষচন্দ্রের সাথে কোনো রকম সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে বাধ্য হয়ে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। জাতীয় আন্দোলনকে গতিশীল ও সংগ্রামমুখী করে তুলতে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি দল গঠন করেন (২২শে জুন, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) পরিণতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন।

সুভাষচন্দ্র বসু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে শান্তিপূর্ন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ইংরেজরা কোনোদিনই ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না। তাই তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৈদেশিক শক্তির সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই সময় সরকার আতঙ্কিত হয় যে বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে সুভাষচন্দ্র ভারতে ব্রিটিশ বিরোধি আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন। কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে পুলিশের নজরদারীতে কোলকাতার বাড়ীতে রাখা হয়। সেখান থেকে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। কোলকাতা থেকে পালিয়ে তিনি রাশিয়ায় পোঁছান এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের বিষয়ে রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

কিন্তু রুশ রাষ্ট্রপ্রধান স্টালিন এসময় রাশিয়ার উপর জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের পরিস্থিতিতে ইংরেজদের সাথে মিত্রতা আশা করেছিলেন। তাই সাহায্যের কোনো আশ্বাস না পেয়ে তিনি বিমানযোগে জার্মানির বার্লিনে চলে আসেন (২৮শে মার্চ, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে)। বার্লিনে সুভাষ জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের সাথে দেখা করেন এবং জার্মানির সহযোগিতায় ব্রিটিশবিরোধী প্রচার ও বন্দি ৪০০ ভারতীয় সেনাদের নিয়ে একটি মুক্তি সেনা গঠনের প্রয়াস চালাতে থাকেন। জার্মানির বিদেশ দপ্তরের তথ্য কেন্দ্রের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র গঠন করেন 'ওয়ার্কিং গ্রুপ ইণ্ডিয়া', যা পরে 'স্পেশাল ইণ্ডিয়া ডিপার্টমেন্ট' - এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে গিরিজা মুখার্জী, এম. আর. ব্যাস, এ. সি. এন. নাম্বিয়াসহ ২০ জন ভারতীয়কে নিয়ে গঠন করেন 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টার'। এর মুখপত্র হয় ইংরেজী ও হিন্দী দ্বিভাষিক পত্রিকা 'আজাদ হিন্দ'। জার্মানির হাতে বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন বা ফ্রি ইণ্ডিয়ান আর্মি' নামে এক সৈন্যদল গঠন করেন (ডিসেম্বর, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে)। এটাই ছিল

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের প্রথম পরিকল্পনা। 'উল্লম্ফনকারী ব্যাঘ্র' ছিল সেনাবাহিনীর প্রতীক। এই সেনাদল সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও বিপ্লবী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সর্বপ্রথম তাঁকে নেতাজী অভিধায়ে ভূষিত করে জয়হিন্দ ধ্বনি দিয়ে অভিবাদন জানায়। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে গতিশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি "আজাদ হিন্দ রেজিয়ো", ন্যাশানাল কংগ্রেস রেজিয়ো, ও 'আজাদ মুসলিম রেডিও' নামে তিনটি গোপন প্রচার কেন্দ্র থেকে ফরাসি, ইংরেজি, হিন্দি, গুজরাতি, বাংলা ভাষাতে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এদিকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জার্মানির হঠাৎ রাশিয়া আক্রমন এবং ওই বছর ৭ই ডিসেম্বর ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণায় বিশ্বযুদ্ধের পট পরিবর্তন ঘটে। সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেন যে ভারতের মুক্তি প্রচেষ্টায় জাপানি সহযোগিতাই অধিকতর কার্যকরী হবে। ঠিক এই সময় জাপান প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুভাষচন্দ্র ৩ মাসের অধিক সময় ধরে এক দুঃসাহসিক সাবমেরিন অভিযান শেষে টোকিও উপস্থিত হন (১৩ই জুন, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে)। ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র পর পর দুবার জাপানি প্রধানমন্ত্রী হিদেকী তোজোর সাথে দেখা করেন। জাপানের আইন সভা ডায়েট - এ সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতে তোজো ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জাপানের তরফে সুভাষকে নিঃশর্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। স্বাধীনতা - সংগ্রামে জাপানি সরকারের সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে যান।

সিঙ্গাপুরে ৪ঠা জুলাই রাসবিহারী সুভাচন্দ্রের হাতে তার প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেস লিগ' বা 'ভারতের স্বাধীনতা সংঘ' - এর দায়িত্বভার অর্পন করেন। পরে ২৫শে আগষ্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ - এর সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার নামে একটি অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর আজাদ হিন্দ সরকার ২৩শে অক্টোবর ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কয়েকদিনের মধ্যে জাপান, জার্মানি, থাইল্যাণ্ড, ইতালি, বার্মা, ক্রোয়েশিয়া, চিন, ফিলিপিন্স, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি ৯টি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় ছিলেন। তিনি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। প্রতিষ্ঠার সময় মোহন সিং ছিলেন এর প্রধান সেনাপতি। রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে এক বিশাল জনসভায় সুভাষচন্দ্রের হাতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব অর্পন করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি এই বাহিনীকে কয়েকটি ব্রিগেডে ভাগ করেন। যেমন - গান্ধি ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড, নেহেরু ব্রিগেড, নারীদের জন্য ঝাঁসির রাণী ব্রিগেড গঠন করেন। ঝাঁসির রাণী ব্রিগেডের নেতৃত্ব দেন শ্রীমতি লক্ষ্মী স্বামীনাথনকে। শেষ পর্যন্ত অনুগামীদের অনুরোধে নেতাজী নিজের নামে সুভাষ ব্রিগেড গঠন করেন।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিদেকী তেজো আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেন। নেতাজী ৩১শে ডিসেম্বর এই দুটি দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখেন যথাক্রমে শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ।

ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রবল বিক্রম ও ত্যাগ তিতিক্ষার অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। খাদ্য ও পত্রের অভাব, প্রবল প্রতিকূল পরিবেশ এবং বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে আজাদ হিন্দ সরকার ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্তে ১৫০ মাইল পর্যন্ত অঞ্চল স্বাধীন করতে সক্ষম হয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই কিন্তু কিছুকাল পরেই ভারতে 'নৌ - বিদ্রোহ' ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন -

"সুভাষ চন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের
হয়ে তোমাকে দেশ নায়কের পদে বরণ করি।"

মাতৃভূমি উদ্ধারে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সেনারা যেরূপে আত্ম বলিদান দিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গান্ধিজী বলেছেন - আজাদ হিন্দ ফৌজ আমাদের সম্মোহিত করেছে। নেতাজীর নাম আমাদের যাদুমুগ্ধ করে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের অবদান

রুবিনা খাতুন, ইতিহাস বিভাগ (২য় সেমিষ্টার)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস দেখলে মনে হবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই স্বাধীনতা সংগ্রাম করছে। জেলখাটাদের মধ্যে নাম আছে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মতিলাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, সরোজিনী নাইডু, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখের। যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের মধ্যে ক্ষুদিরাম বসু, বাঘাযতীন, প্রফুল্ল চাকী, বিনয় - বাদল - দীনেশ, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাস্টারদা সূর্য সেন প্রমুখদের নাম পাওয়া যায়। খুব সহজেই। তাদের নাম অবশ্যই থাকুক, তাদের মহান অবদানের ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা তাদের আত্ম বলিদানে গর্বিত। কিন্তু এই তালিকায় কোথাও কোনো মুসলমানদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। আর থাকলেও মাত্র কয়েকজনের। অথচ ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ এই ১৯০ বছরে হাজার হাজার মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন। জেল খেটেছেন। কোলকাতার সিটি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রধান এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসার শ্রী শান্তিময় রায় ভারতে মুক্তি সংগ্রামেও মুসলিম অবদান নামে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। সেখানে উঠে আসে সব বীরত্বের কথা, যা চেপে রাখা হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে। প্রায়ই বহুলোক প্রশ্ন তোলে মুসলমানদের এদেশে থাকা উচিত নয় কারণ তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি। ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের কোনো অবদান নেই। আর যে কোনো শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পড়লে একথা সত্যি মনে হতেই পারে। কিন্তু সত্য ইতিহাস বলছে স্বাধীনতার যুদ্ধে হিন্দুদের সাথে সাথে মুসলিমদের তাজা রক্তে এই ভারতবর্ষ মুক্তি পেয়েছে। জেলখাটা অজস্র মুসলমানের আত্ম বলিদান এবং ফাঁসি হওয়া অসংখ্য মুসলমানের আত্ম বলিদান এবং ফাঁসি হওয়া অসংখ্য মুসলমানের প্রাণের বিনিময়ে আজ ভারতবর্ষে স্বাধীনতার বাতাস বইছে। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর কথা আমরা সকলে জানি কারণ তিনি কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কোলকাতার হাইকোর্টের বিচারপতি নরম্যান - যিনি অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নিষ্ঠুর প্রহসনমূলক বিচারে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁকে মহম্মদ আবদুল্লা নামে এক বিপ্লবী বীর একাই কোর্টের সিঁড়িতে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেন। সময়টি ছিল ১৮৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। আমরা কয়জন আবদুল্লা নামের এই বীরের নাম জানি? সেই রকমই জানিনা বীর বিপ্লবী শের আলি আফ্রিদির নাম, যার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য ১৪ বছরের জেল হয়। আলি আন্দামানে জেল খাটছিলেন। সে সময়ে কুখ্যাত লর্ড মেও - সেই সময়ে আন্দামান জেল পরিদর্শনে আসেন। শের আলি রক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তার উপর চাকু হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লর্ড মেও শের আলির চাকুর আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। বিচারে শের আলির স্থান হয়নি। এরকম আরও কিছু চেপে যাওয়া ইতিহাসের মুছে যাওয়া নাম আছে। মৌলানা কাসেম সাহেব উত্তরপ্রদেশের দেওয়ান মাদ্রাসাকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক শক্তিশালী কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন। কিন্তু সেই মৌলানা কাসেম সাহেবের নাম ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতের ইতিহাস পাতা উল্টালে যাদের নাম অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়, তারা হলেন - মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, অরবিন্দ ঘোষ, জওহরলাল নেহেরু, প্রমুখ কিন্তু এদের সমতুল্য নেতা আদাউল্লা বুখারি, মৌওলানা হুসেন আহমেদ মাদানি, মওলানা সাহাবুদুল, হাসান দেবজি, মৌওলানা গোলাম হোসেন প্রমুখ। বহুবার দীর্ঘমেয়াদী জেল খেটেছেন। ইতিহাসে নাম নেই এদের। ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য যার নামে সর্বদা ওয়ারেন্ট থাকত সেই তবারক হোসেনের নামও ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তৎকালীন সময়ে যিনি সারা হিন্দুস্থান কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, যার সংস্পর্শে আসলে হিন্দুমুসলিম নব প্রাণ পেতেন সেই হাকিম আজমুল খাঁ - কে লেখক বোধহয় ভুলে গেছেন। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু যার সাহায্য ছাড়া চলতেনই না। যিনি না থাকলে গান্ধী উপাধিটুকুও পেতেন না সেই মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ

দেওয়া হয়। মৌলানা মহম্মদ আলি এবং সৈকত ৫ বার দীর্ঘমেয়াদী জেল খেটেছেন। কমরেড এবং হামদা নামক দুটি ইংরেজ বিরোধী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাদের নাম ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় জায়গা পায় না। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের কথা আমরা সকলে জানি কিন্তু এটা কি জানি - এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের প্রাণপুরুষ ছিলেন ডবল এম. এ করা এবং পি. এইচ. ডি

ডিগ্রিধারী প্রভাবশালী জেলখাটা সংগ্রামী নেতা ব্যারস্টার সাইফুদ্দিন কিচলু। বিপ্লবী মীর কাশেম, টিপু সুলতান, মজনু সা ইউসুফ এনারা ব্রিটিশদের গুলির আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও ইতিহাস তাদের স্মরণ করেনি। মৌলানা রসিদ আহমেদ গাউকরি, তাকে নির্মমভাবে ফাঁসি দিয়ে পৃথিবী থেকে মুছে দিল ইংরেজরা। ইতিহাস লেখক কেন তার নামও মুছে দিলেন ইতিহাস থেকে। জেলখাটা নেতা ইউসুফ, নাসির খান, গাজিবাবা ইয়াসিন, ওমর খান তাদের নাম আজও ইতিহাসে নেই। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরে কুদরাতুল্লা খানের মৃত্যু হল কারাগারে, ইতিহাসের পাতায় তার মৃত্যু ঘটল কীভাবে? নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ডানহাত ও বামহাত যারা ছিলেন ইতিহাসে তাদের নামও খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা হলেন আবির হাসান সানওয়াজ খান, আব্দুল করিম গনি প্রমুখ, এদের অবদান লেখক কী করে ভুলে গেলেন। বিদ্রোহী গোলাম রব্বানী মৌলানা আক্রাম খাঁ, সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আনসার এদের রক্ত আর নির্মম মৃত্যু কী ভারতের স্বাধীনতায় কাজে লাগেনি? বিখ্যাত নেতা জহরুল হাসানকে হত্যা করলে মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষনা করলেন ইংরেজ সরকার। মৌলানা হজরত মুহাদী এমন এক নেতা যিনি সর্বপ্রথম আওয়াজ তোলেন - ব্রিটিশ বিহীন স্বাধীনতা চাই। আমরা ক'জন জানি একথা? জেলে মরে পচে গেলেন মৌলানা উবাইদুল্লা সিন্দি। তার নাম কী ইতিহাসে ওঠার মতো নয়? হাফেজ নিসার আলি - যিনি তিতুমির নামে বিখ্যাত। ব্রিটিশরা তার বাঁশের কেল্লাসহ তাকে ধ্বংস করে দেয়। তার সেনাপতি গোলাম মাসুদকে কেল্লার সামনে ফাঁসি দেওয়া হয়। আমরা কজন জানি সেকথা। বিখ্যাত নেতা বীর আসফাকুল্লা খাঁ যাকে মাত্র ২৭ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য নির্মমভাবে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলানো হয়েছিল। তার কথা ইতিহাস বইয়ের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বীর আব্দুল সুকুর, আবদুল্লা মীর ইতিহাসে আজও ব্রাত্য।

সূর্য সেন ঃ এক অনন্য মুক্তিযোদ্ধার কাহিনী

দিশা গুঁই, ইতিহাস বিভাগ (২য় সেমিষ্টার)

ভারতের স্বাধীনতা একদিনে আসেনি। একভাবেও নয়। এর পেছনে আছে কত মানুষের ত্যাগ, প্রেরণা ও জীবনপণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সন্ত্রাস বাদীদের উপর প্রচণ্ড দমনপীড়ন চালানো হয়েছিল। এদের অধিকাংশ নেতারই হয় জেল হয়েছিল, না হয় পলাতক ছিলেন। দেশকে মুক্ত করার জন্য সারা ভারতে তখন আন্দোলন চলছে।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আবির্ভাব ঘটে সূর্য সেনের। তিনি ১৮৯৪ সালের ২২শে মার্চ চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি চট্টগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকায় 'মাস্টারদা' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বৈপ্লবিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ সালে চট্টগ্রামে গঠন করেন গুপ্ত বিপ্লবী দল। ১৯২৪ সালে বাংলাদেশের ৭৪ জন বিপ্লবী গ্রেফতার হন। মাস্টারদা গা ঢাকা দেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ১৮২৬ সালে কোলকাতার রাজপথে তিনি বন্দী হন। ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত দু বছর জেলখাটার পর তিনি কংগ্রেসের হয়ে কাজ করতে থাকেন। তিনি কবিতা ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। সূর্যসেন চট্টগ্রামের দুটি অস্ত্রাগার দখল করে সেগুলোর অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে সেই অস্ত্র দিয়ে বিপ্লবীদের একটা বড়ো সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলায় শহরের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা অকেজো করার এবং রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। খুব সতর্কতার সাথে ১৯৩০ এর ১৮ই এপ্রিল রাত ১০টায় পরিকল্পনা কার্যকর করা শুরু হলো। তারা বিভিন্ন অস্ত্রাগার দখল করে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেন। আবার পুলিশের অস্ত্রাগার দখল করে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'গান্ধীজির রাজ কায়েম হলো' প্রভৃতি স্লোগান দিতে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা গোলাবারুদ খুঁজে পেলেন না। ফলে বিপ্লবীদের পরিকল্পনায় মস্ত বড়ো ক্ষতি হলো। তারা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করতে ও ট্রেন চলাচল ব্যাহত করতে পেরেছিলেন। এই আক্রোমনে অংশ নিয়েছিল মোট ৬৫ জন। সবকটি বিপ্লবী দল জড়ো হয়েছিল পুলিশ অস্ত্রাগারের বাইরে। সেখানে ধবধবে সাদা খাদি ধুতি, লংকোট ও কড়া ইস্ত্রি করা গান্ধী টুপি পরা সূর্যসেন সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করলেন, 'বন্দে মাতরম' ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ঘোষণা করলেন অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা। শহরের মধ্যে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালানো সম্ভব নয়। তাই তারা চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ভোর হওয়ার আগেই চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকায় চলে গেলেন। ২২শে এপ্রিল দুপুরের পর কয়েক হাজার সৈন্য জালালাবাদ পাহাড়ে তাঁদের ঘিরে ফেলল। প্রচণ্ড লড়াইয়ে ৮০ জনেরও বেশি ব্রিটিশ সৈন্য ও ১২ জন বিপ্লবী মারা যাওয়ার পর সূর্যসেন আশেপাশের গ্রামগুলিতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামবাসীর অধিকাংশ ছিল মুসলমান। তারা পলাতক বিপ্লবীদের খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছেন। সূর্যসেন শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হন ১৯৩৩ এর ১৬ই ফেব্রুয়ারী। বিচারের পর তার ফাঁসি হয় ১৯৩৪ এর ১২ই জানুয়ারী। আরও অনেকে গ্রেফতার হন ও তাদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়। সূর্য সেনের শবদেহ দুটি স্টীমারে করে নিয়ে গিয়ে লোহার টুকরো বেঁধে বঙ্গোপসাগরের জলে ডুবিয়ে দেয় ইংরেজরা। যাতে এতটুকু কোনো স্মৃতিচিহ্ন না থাকে। অস্ত্রাগার আক্রমন ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পুনরুজ্জীবিত

হওয়ায় সরকার প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেও বর্বর দমনপীড়ন চালাতে শুরু করেন। সরকার ২০টি দমনমূলক আইন পাশ করে সব জাতীয়তাবাদীর বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেন। চট্টগ্রামে জ্বালিয়ে দিলেন বেশ কয়েকটা গ্রাম। সাধারণভাবে সৃষ্টি করলেন সন্ত্রাসের রাজত্ব। রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৯৩৩ এ জওহরলালকে গ্রেপ্তার করে দুবছর কারাদণ্ড দেওয়া হল। কোলকাতায় এক বক্তৃতায় তিনি সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদের নীতিকে ব্যর্থ ও সেকেলে বলে সমালোচনা করলেও বিপ্লবী যুবকদের বীরত্বের প্রশংসা ও পুলিশি নির্যাতনের নিন্দা করেছিলেন তিনি। বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের এই নতুন পর্যায়ের একটা উল্লেখযোগ্য দিক তরুণীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। সূর্যসেনের নেতৃত্বে তারা বিপ্লবীদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, সংবাদ বাহক ও অস্ত্ররক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন, লড়াই চালিয়েছিলেন বন্দুকের মাধ্যমে। আক্রমন চালাতে গিয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার নিহত হন, আর কল্পনা দত্ত গ্রেপ্তার হন। সূর্যসেনের সাথে তার বিচার ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। সূর্যসেন আনন্দ গুপ্তকে বলেছেন, “নিবেদিত প্রাণ একদল যুবক - যুবতীকে ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসবাদের বদলে সংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রামের পথ দেখাতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের সবাইকে হয়তো মরতে হবে। কিন্তু এরকম এক মহৎ আদর্শের জন্য আমাদের আত্মত্যাগ বিফলে যাবে না।”

মৃত্যুঞ্জয়ী অমর শহীদ ক্ষুদিরাম

রিম্পা দে, ইতিহাস বিভাগ (৪র্থ সেমিস্টার)

"দশ মাস দশ দিন পরে
জন্ম নেব মাসির ঘরে মাগো ....
তখন যদি না চিনতে পারিস
দেখবি গলায় ফাঁসি।"

ঘুরে আসি বলে ফিরে এল না। মৃত্যু হল সবার মাঝে - মৃত হলে না। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্নিপুত্র শহীদ ক্ষুদিরাম। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে এলেন বাংলার তরুন প্রজন্ম। তাঁদের মধ্যে অগ্নিকিশোর বৈপ্লবিক ক্ষুদিরাম বসু ছিলেন প্রথম শহীদ, যিনি তাঁর অদম্য জেদ, সৎ সাহস ও ঐকান্তিক প্রবৃত্তি দিয়ে মৃত্যুভয়কে জয় করেছিলেন। এই মৃত্যুঞ্জয়ী কিশোর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার মৌবনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু ও মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। ক্ষুদিরাম বসু ছিলেন তাঁদের চতুর্থ সন্তান। তৎকালীন সমাজের নিয়ম অনুযায়ী পুত্রের মৃত্যুভয়ের আশঙ্কায় ক্ষুদিরামকে তার বড় বোনের কাছে মাত্র তিন মুঠো খুদ অর্থাৎ শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। তাঁরপর ক্ষুদিরাম তাঁর বড়ো দিদি অপরূপা দেবীর পুত্র ছায়ায় স্নেহ ভালবাসায় বড়ো হতে থাকে।

ক্ষুদিরাম বসু প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছানোর অনেক আগেই একজন ডানপিটে, বাউণ্ডুলে, রোমাঞ্চপ্রিয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় হাটগাছিয়া পাঠশালায় কিন্তু ভগ্নীপতি অমৃতলালবাবুর সঙ্গে তিনি পুনরায় ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেন। স্কুলজীবন শেষ করে তিনি কলেজে পড়াকালীন হেমচন্দ্র কানুনগো, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু - প্রমূখের বিপ্লবী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ক্ষুদিরামের যে অসাধারণত্ব হেমচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল তা হল - **"অন্যায় অবিচারের প্রতি তীব্র অনুভুতি, সেই অনুভুতির পরিণতি বক্তৃতায় নয়, বৃথা আন্দোলনে নয়, অসহ্য দুঃখ - কষ্ট, বিপদ - আপদ, এমনকি মৃত্যুকে বরণ করে, প্রতিকার অসম্ভব জেনেও শুধু সেই অনুভুতির জ্বালা নিবারণের জন্য, নিজ হাতে অন্যায়ের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রতিবিধানের চেষ্টা করবার ঐকান্তিক প্রবৃত্তি ও সৎসাহস ক্ষুদিরামের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।"**

মেদিনীপুরে আসার পরই তাঁর বিপ্লবী জীবনের অভিষেক রচিত হয়। **সত্যেন্দ্রনাথ বসুর** নির্দেশে **"সোনার বাংলা"** শীর্ষক বিপ্লবাত্মক ইশতেহার বিলি করে তিনি গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে **জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু** ও **রাজনারায়ণ বসুর** উদ্যোগে গঠিত বিপ্লবী গুপ্ত সংগঠনে যোগদান করেন। ক্ষুদিরাম তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নিকট হতে এবং **শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা** পড়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে অনুপ্রাণিত হন। তিনি বিপ্লবী রাজনৈতিক দল **'যুগান্তর'** -এ যোগ দেন। ১৬ বছর বয়সে একের পর এক বোমা হামলার দায়ে তাঁকে আটক করা হয়। মুজাফরপুর জেলার **জর্জ ডি. এইচ. কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য 'যুগান্তর' দলের পক্ষ থেকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রথমে প্রফুল্ল চাকীকে দায়িত্ব দেন, কিন্তু পরে হেমচন্দ্র কানুনগোর অনুরোধে ক্ষুদিরামকে প্রফুল্লচাকীর সহযোগী হিসেবে পাঠানো হল**। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল রাত ৮টা ৩০ মিনিটে কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য তারা পকেটে বোমা ও রিভলবার নিয়ে প্রস্তুত থাকেন মুজাফপরপুরের একটি ধর্মশালার নিকট। ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়ি লক্ষ করে তাঁরা বোমা ছুঁড়লেন। **কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে গাড়ির মধ্যে তখন কিংসফোর্ড ছিলেন না। মারা গেলেন নির্দোষ মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি।**

ইউরোপিয়ান ক্লাবের সামনে ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তারের আগেই আত্মহত্যা

করেন। ২১শে মে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিচার শুরু হয়। মামলায় অভিযুক্ত ক্ষুদিরাম স্বীকারোক্তিতে বলেন -

"আমার ইচ্ছা ছিল রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ে কিংসফোর্ডকে হত্যা করবো।" ফাঁসির রায় শোনার পর ক্ষুদিরামের মুখে হাসি দেখা যায়, যা দেখে ভয় পেয়েছিলেন স্বয়ং যমরাজও। **ফাঁসি দেওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর ৭ মাস ১১ দিন**। বিচারক কর্নডফ তাঁকে প্রশ্ন করেন - তাঁকে ফাঁসিতে মরতে হবে এটা সে বুঝেছে কিনা? **তিনি হাসিমাখা মুখে জবাব দেন ভয় করবো কেন? আমি কি গীতা পড়িনি, আসলে গীতা পাঠের ফলে তিনি মৃত্যুভয়কে জয় করেছিলেন। আত্মার মৃত্যু হয় না, জীর্ন কাপড়ের মতো দেহের বদল হয়,** সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ক্ষুদিরামকে বলেন - **"তুমি কি জানো রংপুর হইতে আমরা কয়েকজন উকিল তোমাকে বাঁচাইতে আসিয়াছি? তুমি তো নিজেই আপন কৃতকর্ম স্বীকার করিয়াছ।"** ক্ষুদিরামের উত্তর ছিল - **"কেন স্বীকার করবো না?"**

১১ আগষ্ট জেলের ভিতরে ১৬ ফুট উঁচু ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে আসা হয় ক্ষুদিরামকে। ক্ষুদিরাম হাঁটছিলেন আগে - তিনিই যেন পুলিশকে টেনে আনছেন। গলায় ফাঁসির দড়ি পড়ানো মাত্রই দামাল ছেলের প্রশ্ন - **"ফাঁসির দড়িতে মোম দেওয়া হয় কেন?** ১০ই আগষ্ট ক্ষুদিরাম বলেছিলেন - **"আমি আগামীকাল ফাঁসির আগে চর্তুভূজার প্রসাদ খাইয়া বধ্যভুমিতে যাইতে যাই**। তিনি কালিদাসবাবুকে একথা বলেছিলেন - **"রাজপুত নারীরা যেমন নির্ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়া জওহরব্রত উদযাপন করত, আমিও তেমন নির্ভয়ে প্রান দিব।"** ফাঁসির আগে ক্ষুদিরামকে শেষ ইচ্ছা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন **তিনি বোমা বানাতে পারেন। অনুমতি পেলে সেটা দেশের বিপ্লবী যুবসমাজকে শিখিয়ে যেতে চান।**

একবার বিদায় দে মা - ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরব ফাঁসি - দেখবে ভারতবাসী।

হাসিমাখা মুখে তিনি ফাঁসির মঞ্চে গাইলেন জীবনের জয় গান। **অমর শহীদ তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী, বীর মহান, অমর হল তোমার এই আত্মবলিদান।**

ইতিহাসের পাতা হতে, ভারতরত্ন আম্বেদকর সম্বন্ধে কিছু কথা

সৌম্যদীপ হালদার, ইতিহাস বিভাগ (৩য় সেমিস্টার)

বংশ পরিচয় ঃ ঠাকুরদাদা - মালেজি শকপাল, বাবা - রামজি শকপাল, পিসিমা - মীরাবাঈ, মাতা - ভীমা বাঈ।

মা বাবার চতুর্দশ ও শেষ সন্তান ভীমরাও শকপাল। ডাক নাম তাঁর ভীম। বড় হয়ে সারাবিশ্বে পরিচিত হন - বাবা সাহেব আম্বেদকর নামে। ডঃ আম্বেদকর ছিলেন ভারতের নিপীড়িত দলিত মানুষের মুক্তিদূত হিসেবে। মধ্যপ্রদেশের মউ শহরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় ভীমরাও শকপাল আম্বেদকর জন্মগ্রহণ করেন। (১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল)। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার আম্বাবাদ গ্রামের বাসিন্দা মহারাষ্ট্রের অস্পৃশ্য শ্রেণীর "মাহার" সম্প্রদায়ের মানুষ। রামজির বন্ধুত্ব ছিল জ্যোতিরাও ফুলের সাথে, যিনি ছিলেন দলিত সম্প্রদায়ের অনন্য সেনানী। ভীমরাও - এর মা ভীমাবাঈ বোম্বের থানে জেলার মুরাদাবাদ গ্রামের এক শিক্ষিত অস্পৃশ্য ধনী পরিবারের মেয়ে।

রামজী শকপাল বোম্বের সতীরায় পূর্তবিভাগে চাকরী নেন। সতীরায় প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হলে তার পদবী হয় "অম্বাবাদেকর"। জনৈক ব্রাহ্মণ শিক্ষক তাঁর নিজের পদবি আম্বেদকর। তিনি ভীমরাও অম্বাবাদকর এর পদবী পালটিয়ে নিজের পদবী আম্বেদকর লিখে দেন। সেই থেকে উনার নাম হয়ে যায় ভীমরাও আম্বেদকর। ভীমরাও - এর বাবা রামজি শকপাল একটা কাজ নিয়ে বোম্বে চলে আসেন। ভীমরাওকে মারাঠা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নামি স্কুল এনফিলস্টোন স্কুলে ভর্তি করেন। ঘরের জায়গার অভাবে বোম্বের রেলস্টেশনের লাগোয়া বাগানে বসে ছুটির দিনে পড়াশোনা করতেন তিনি। বাগানে পড়ার সময় আলাপ হয় উইলসন স্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণাজি অর্জুন কেলুসকরের সাথে।

১৯১০ সালে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এ পাশ করেন। বরোদার মহারাজা শিবাজী রাও সায়কোয়াড মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনারের সাথে আলাপ হয়। বোম্বের প্যারেল ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের তিনতলায় ৫০ এবং ৫১ নং ঘরে চলে আসেন। ১৯১৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী আম্বেদকরের বাবা মারা যান। শর্তসাপেক্ষে বরোদার মহারাজার বৃত্তি নিয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে। লিভিংস্টোন হলেন ডরমিটোরিত থাকতেন। ওখানে এক পারসি ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তার নাম নাভাল ভাহোন। অধ্যাপক সিডনি ওয়েবকে ধরে চার বছর পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার অনুমতি পান। বোম্বের সিডেনহাম কলেজ অফ কমার্স হলেন মিক্স এ বোম্বের প্রাক্তন গর্ভনর - এর সুপারিশে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। ২ বছর চাকরি করার পর চাকরি ছেড়ে দেন। আবার লণ্ডনে পড়তে এলেন। কোলাপুরের মহারাজা আর্থিক সাহায্য করেন। পারসি বন্ধু নাভাল ভাহোন পাঁচ হাজার টাকা ধার দেন। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েনস্ এ অর্থশাস্ত্র Economics নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন।

কিছুদিন পর ট্রেইস ইনে ব্যারিস্টারী পড়া শুরু করেন। জার্মানের বনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য বন্ধু ভাথেনার থেকে আরও দু হাজার টাকা ধার নেন। ১৯২৩ সালে বোম্বে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি শুরু করেন। কোলাপুরের মহারাজা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তাঁর ভূমিকা সারা ভারতবর্ষে জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। আম্বেদকর মহারাজার প্রিয় মানুষ ছিলেন। তাঁর বদান্যতার কিছু সাংগঠনিক চিন্তার প্রভাবান্বিত হয়, কাজ শুরু করেন, যেমন -

১) একটি সর্বভারতীয় অস্পৃশ্য সংগঠন তৈরী করেন।

২) ১৯২৪ সালে বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভা গঠন।

১৯২৩ সালের ৪ঠা আগষ্ট বোম্বে বিধান সভায় এস. কে. বানের প্রস্তাব সরকারী টাকায় তৈরী সমস্ত কিছু অস্পৃশ্যরা ভোগ করার অধিকার পায়। সেই অনুসারে মহোদ পুরসভার স্থানীয় চৌকীদার পুকুর অস্পৃশ্যদের জন্যে উন্মুক্ত করেন।

আম্বেদকর ১০ হাজারের ও বেশী অস্পৃশ্য সমাজের লোকজন নিয়ে চৌদার পুকুরের জল পান করেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। চৌদার পুকুরের জল পান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এখানেই তাঁকে "বাবা সাহেব বলে সম্বোধন", সামাজিক আন্দোলন এবং সরকারের তৈরী নতুন আইনগুলি ভারতীয় সামাজিক কুপ্রথার জগদ্দল পাথরটিকে একটুও নড়াতে পারেনি।

আম্বেদকর বুঝতে পেরেছিলেন জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের অস্পৃশ্য সমাজের প্রতি যে চরম অবহেলা, তাতে দেশ স্বাধীন হলেও অস্পৃশ্যদের দুর্দশা ঘুচবেনা।

১৯২৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর হিন্দু ধর্মের জঘন্য বিধিবিধান মনু সংহিতা পুড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মনু সংহিতার বর্ণাশ্রম প্রথা চালু করেছেন এবং অন্ত্যজ অস্পৃশ্য সমাজের জন্য নিয়ে এসেছেন চরম সর্বনাশ।

১৯২৮ সালে গনপতি পূজামণ্ডপে অস্পৃশ্য সমাজের প্রবেশের অধিকার আদায় করে নেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রতিভা, বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য ও আইনি জ্ঞানের জন্য ডঃ আম্বেদকরকেই "ভারতীয় স্বাধীনতা" গৃহীত হলে ভারতের জাতীয় পতাকার স্বরূপ নিরুপণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় ভীমকেই। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র মনুস্মৃতি পুড়িয়ে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। সেই তিনি হলেন ভারতের নতুন স্মৃতিগ্রন্থ, সংবিধান রচনার প্রধান রূপকার।

১৯৫৫ সালে শরীর ক্রমশ খারাপ হয়। শরীর খারাপের সময় আর একটি যন্ত্রণায় তিনি চোখের জল ফেলতেন। নির্যাতিত জন সমাজের জন্য যেটুকু অর্জন করা গেছে তার বেশির ভাগটাই কুক্ষ্যিগত করে শিক্ষিত মানুষেরাই ভোগ করেছেন। সমাজের মানুষের কথা না ভেবে তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিকেই বড় করে দেখেছেন।

১৯৫৬ সালের ১৪ই অক্টোবর নাগপুরে দীক্ষাভূমিতে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তিনি বলেন - "আমি অচ্ছুত হয়ে জন্মেছি কিন্তু অচ্ছুত থেকে মরব না।" এই প্রতিজ্ঞাপূরণে তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন। আম্বেদকরের মূল লক্ষ্য ছিল - সমাজের নির্যাতিত শ্রেণীকে সামাজিক অপমান ও অসম্মান থেকে রক্ষা করা। আম্বেদকর প্রায়ই বলতেন - "নিজেরা জোর করে আদায় করে না নিলে দয়া করে কেউ দলিতদের হাতে অধিকার তুলে দেবে না।" তিনি সেই জন্য বলতেন - "আত্মনির্ভর হও - আত্ম উন্নয়ন করো এবং নিজেই নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করো।"

ডঃ আম্বেদকর "বহিষ্কৃত ভারত" নামে একটি মারাঠি পাক্ষিক পত্রিকা বের করেন - তাতে তিনি লেখেন - তিলক যদি অস্পৃশ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার" না বলে বলতেন - "অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ আমার জন্মগত অধিকার।"

স্বাধীনতা আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা ছিলেন উচ্চবর্ণ শ্রেণীর। আম্বেদকর বুঝতে পেরেছিলেন জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের অস্পৃশ্য / দলিত সমাজের প্রতি যে চরম অবহেলা তাতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও অস্পৃশ্যদের দুর্দশা ঘুচবে না। তাঁর কাছে দেশের স্বাধীনতার থেকে অস্পৃশ্যদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব আরো বড়ো।

"One man one value" তিনি চিনাধারার আদর্শ। কিন্তু হিন্দুধর্মের বর্ণ ব্যবস্থার তিনি নিচুস্তরে জন্মগ্রহণ করে সেই সমমর্যাদা পাননি। কিন্তু তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা - **"আমি অচ্ছুত হয়ে জন্মেছি কিন্তু অচ্ছুত হয়ে মরব না।"**

তাঁর প্রতিজ্ঞা সার্থক হয়েছে। গনতন্ত্র ভারতবর্ষের সংবিধান রচয়িতা মহান সন্তান, নিপীড়িত মানুষের অধিকারটুকু ছিনিয়ে দিয়ে ভারতভূমিকে গর্বিত করেছেন। **তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি।**

মৌমাছি ঃ একটি নিদর্শন

রুবেল সেখ, বিজ্ঞান বিভাগ (৩য় সেমিষ্টার)

সৃষ্টি কর্তার নিদর্শনমূলক সৃষ্টির একটি হল মৌমাছি। মৌমাছি হল শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি পরিশ্রমী পতঙ্গ বিশেষ প্রানী। মৌমাছির মধু ও মোম অন্ততঃ মেসোলিথিক যুগ থেকে মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। মিশরীয়, মায়ান, গ্রীক, মিনোয়ান, হিট্টাইট, হিন্দু (অথর্ব বেদ) প্রভৃতি পুরাণে ও লোক কাহিনীতে মৌমাছির বর্ণনা আছে। পৃথিবীতে ২০,০০০ প্রজাতির মৌমাছি আছে, যার অনেকেই অজানা। মৌমাছির মাত্র ৮টি প্রজাতি স্বীকৃত। আন্টার্কটিকা ব্যতিত সব মহাদেশে মৌমাছি দেখা যায়। আমাদের দেশে মূলত এপিস সেরেনা ইণ্ডিকা ও এপিস মেলিফেরা প্রজাতির মৌমাছি দেখা যায়। একটি মৌচাকে ৩ প্রকারের মৌমাছি থাকে, যথা - রাণী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছির সাথে মিলন করে ডিম পাড়ে। কলোনী নিয়ন্ত্রণ করতে এক বিশেষ রাসায়নিক ফেরোমন ছড়ায়। পুরুষ মৌমাছি (ড্রোন) ঃ একমাত্র কাজ রাণী মৌমাছিকে প্রজননে সহায়তা করা। কর্মী মৌমাছি (শ্রমিক) ঃ এটি স্ত্রী মৌমাছি তবে প্রজননে অক্ষম। এই মৗমাছি চাক নির্মাণ করা, ড্রোনকে খাওয়ানো, রাণীর দেখাশোনা করা থেকে মধু অন্বেষন, সব কাজই করে। একটি কলোনীতে ২০,০০০ - ৬০, ০০০ কর্মী মৌমাছি ৩০০ - ৪০০ পুরুষ মৌমাছি, আর মাত্র একটাই রাণী মৌমাছি থাকে, যার হাতে ন্যস্ত থাকে সাম্রাজ্য চালানোর অস্ত্র। কারোর গায়ে মৌমাছির হুল ফুটলে জানতে হবে এটি স্ত্রী মৌমাছির কাজ, পুরুষ মৌমাছির হুল থাকে না। হুলে ফর্মিক অ্যাসিড থাকায় ব্যথা ও জ্বালা করে। ব্যথা দিলেও মৌমাছির মূল কাজ পরাগায়ন করা। সারা বিশ্বে পরাগায়নের ৬০ শতাংশই মৌমাছির দ্বারায় হয়ে থাকে। আর সেই মৌমাছি পরিবেশ পরিবর্তন, দূষণ, মানুষের জন্য বিপদের মুখে, তাই মানুষকেই মৌমাছিকে রক্ষা করতে হবে।

রাণী মৌমাছি অনেক ড্রোনের সাথে মিলন করে শুক্রানু স্পার্মাথেকায় সঞ্চয় করে। তারপর রাণী অনিষিক্ত ও নিষিক্ত দুই রকম ডিম দেয়। অনিষিক্ত ডিমগুলো ড্রোনে পরিণত হয় আর নিষিক্ত ডিম কর্মী বা কুমারী রাণী হয়। ডিম লার্ভায় পরিণত হলে প্রথমে রাজকীয় জেলি (কর্মী মৌমাছির মাথার গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত) খাওয়ানো হয়, তবে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের রাণীকে জেলি খাওয়ানো অব্যাহত রাখা হয়। রাণীরা আর্বিভাব হওয়ার পর নিজেদের মধ্যে লড়াই করে যতক্ষণ না চাকে একটি রাণী হয়। পুরনো রাণী ও তার কিছু কর্মীরা নতুন রাণীর আর্বিভাবের সময় মৌচাক ছেড়ে চলে যায় ও অন্যত্র বাসা নির্মান করে। ঝাঁকের ঋতুতে, দুর্বল রাণীর উপস্থিতিতে, রাণীর অনুপস্থিতিতে কর্মীরা অনিষিক্ত ডিম পাড়তে পারে, যা ড্রোনের জন্ম দেয়।

প্রাচীন কাল থেকেই মৌমাছিকে নিয়ে মানুষের ভিন্ন ও ভ্রান্ত ধারণা ছিল। এমনকি শেক্সপিয়ার - এর যুগেও ছিল। শেক্সপিয়ার তাঁর হেনরি দী ফোর্থ (*Henry the fourth*) নাটকটি ১৫৯৫ সালে লেখেন এবং ১৬০৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই নাটকের কিছু সংলাপে মৌমাছি নিয়ে বলেন যে, মৌমাছিরা সৈনিক এবং তাদের রাজা আছে যার কাছে তারা জবাবদিহি করে। আর কর্মী মৌমাছিরা পুরুষ এবং তারাই চাক নির্মাণ করে ও মধু সংগ্রহ করে তারা বাসায় ফিরে আসে। সেই সময় মানুষ ভাবত যারা মৌচাক নির্মাণ ও মধু সংগ্রহ করে তারা পুরুষ মৌমাছি আর স্ত্রী মৌমাছিরা শুধু বাচ্ছা লালনপালন করে। যা মোটেও সঠিক নয়। প্রাচীনকাল থেকে এটা নিশ্চিত ছিল রাজা মৌমাছি মৌচাকে শাসন করত। ১৫৮৬ সালে লুইস মেণ্ডেজ ডি. টরেস প্রকাশ করেন মৌচাকটি একটি মহিলা দ্বারা শাসিত হয়, তবে টরেস বলেন যে রাণী মৌমাছি একটি 'বীজ' এর মাধ্যমে উপনিবেশের অন্যান্য মৌমাছি উৎপাদন করে। ১৬০৯ সালে চার্লস বাটলার দাবি করেন ড্রোনের লিঙ্গ পুরুষ ও রাণী মহিলা, তিনি ভুলভাবে বিশ্বাস করেন যে ড্রোনগুলো কর্মী মৌমাছির সাথে মিলন করে, যারা ডিম পাড়ে। ১৬৩৭ সালে রিচার্ড রেমনান্ট দেখেন কর্মী মৌমাছিরা স্ত্রী। বিজ্ঞানী জান

সোয়ামারডাম (১৬৩৭ - ১৬৮০) - এর *"Bible of Nature"* তে চাক্ষুস প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছিল যে তাঁর সমসাময়িকেরা ভুলভাবে রাণী মৌমাছিকে পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করতো। সোয়ামারডামও প্রমাণ দিয়েছেন যে রাজা মৌমাছি প্রকৃতপক্ষে রাণী মৌমাছি, যে কিনা উপনিবেশের একমাত্র মা, ড্রোনগুলো পুরুষ ও কর্মীগুলো স্ত্রী, যে পরাগ সংগ্রহ থেকে চাক নির্মাণ সব কাজ করে। সপ্তদশ শতকে প্রমাণ হয় যে ফুলের মধু সংগ্রহ, চাক নির্মাণ সব কাজ স্ত্রী মৌমাছি করে।

কোরানের সূরা আন - নাহল এর ৬৮-৬৯ তম আয়তে উল্লেখ আছে -----"আর তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে নির্দেশ দিলেন, পাহাড়ে, গাছে এবং উঁচু চালে বাসা তৈরী কর। অতঃপর প্রতিটি ফল থেকে আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের শেখানো সহজ পদ্ধতি অনুসরণ কর। এর পেট থেকে রং-বেরং এর পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য আছে আরোগ্য।

কোরান নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায়, তাই তাকে ব্যাখ্যাও করতে হবে আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী। আমাদের বাংলা ভাষায় লিঙ্গভেদে ক্রিয়াপদ একই থাকে। যেমন - ফাতিমা (মেয়ে) ভাত খায় আর আলী (ছেলে) ভাত খায়। কিন্তু আরবিতে তা হয়না। পুরুষ হলে এক ক্রিয়াপদ হয় আর স্ত্রী হলে আর এক ক্রিয়াপদ হয়। এবার দেখতে হবে কোরান কাকে নির্দেশ করে, পুরুষ? নাকি স্ত্রী? যদি পুরুষকে করে তাহলে আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী কোরান ভুল।

বাসা তৈরী করা বা নির্মাণ করার ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ইত্তাখিজি ও পুরুষলিঙ্গ হিসেবে ইত্তাখিজ ব্যবহার হয়, উপরিউক্ত আয়াতে স্ত্রীলিঙ্গের ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয়েছে। খাও এর ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে কুলী ব্যবহার হয়েছে। আর চল (অনুসরণ) এর ক্ষেত্রেও স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ফাসলুকী (উসলুকী) ব্যবহার হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় কোরান পুরুষ মৌমাছিকে নির্দেশ করেনি বরং স্ত্রী মৌমাছিকে নির্দেশ করেছে, যা আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী একদম ঠিক। আধুনিক অনুসন্ধানে যেটা ৩০০ বছর আগে জানা যায় কোরান সেটা ১৪০০ বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

১৯৭৩ সালে অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী কার্ল ভন ফ্রিশ (*Karl von Frisch*) *'Physiology of Medicine'* বিভাগে মৌমাছির আচরণ ও যোগাযোগ নিয়ে গবেষণার জন্য নোবেল পান। তিনি তার রচিত বই *'The Dancing Bees'* সব কিছু তুলে ধরেন। বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন, যখনই কোনো মৌমাছি কোনো নতুন খাবারের সন্ধান পায়, বাসায় এসে অন্য কর্মী মৌমাছিদের এক বিশেষ নৃত্য দ্বারা তার পথের ঠিকানা ও খাবারের পরিমাণ বাতলে দেয়। যদি খাবার ৫০-১০০ মিটারের মধ্যে হয় তাহলে এক বিশেষ 'বৃত্তাকার নৃত্য' করে আর যদি খাবার এর থেকেও দূরে থাকে তাহলে 'ওয়াগেল নৃত্য' করে। উক্ত আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে 'তোমার প্রতিপালকের শেখানো সহজ পদ্ধতি অনুসরণ কর।' এমন করেই মৌমাছি তার পালনকর্তার প্রশস্ত পথের সন্ধান পায়।

মৌমাছি আমাদের অনেক কিছু শেখায় --- কিভাবে পরিশ্রম করতে হয়, দায়িত্ববোধ শেখায়, শত্রুর মোকাবিলা করতে শেখায়, কিভাবে এক হয়ে থাকতে হয়। রানী, কর্মী, ড্রোন একে অপরকে ছাড়া অসম্পূর্ণ, একা কারোর অস্তিত্ব নেই। কিভাবে নিজের দেহে মোম তৈরী করে? আবার সেই মোম দিয়েই বাসা বানায়। কিভাবে মধু তৈরী করে? যাতে মানুষের জন্য আছে আরোগ্যতা। সত্যিই মৌমাছি একটি নিদর্শন। তাই সৃষ্টিকর্তা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন ৬৯ তম আয়াতের শেষাংশে---- "চিন্তাশীল মানুষের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী

রাকেশ ধর, ইতিহাস বিভাগ (৬ষ্ঠ সেমিষ্টার)

"আমি নারী বলে আমাকে, ভয় করো, না?
বিদ্যুৎ শিখরে হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন"।

স্বাধীনতা দিবসের দিনটিকে প্রতিবছর আমরা বেশ আড়ম্বরের সাথেই পালন করে থাকি। লালকেল্লা থেকে শুরু করে অজ পাড়া গ্রাম, ছোটো থেকে বড়ো নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। আর সেই অনুষ্ঠানে স্মরণ হয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। কিন্তু একবারও কী ভেবে দেখেছেন যে, এই বিপ্লবীদের মধ্যে নারীদের ভূমিকা ঠিক কতোটা? আমরা ভুলে গেছি সেই মহান ভারতীয় নারীদের আত্মবিসর্জনের কথা যারা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্য। এমনই বেশ কয়েকজন ভারতীয় নারীর স্বাধীনতা সংগ্রামী রয়েছেন যাদেরকে আমরা হয়ত অনেকেই জানি না। আবার যারা জানি তারাও হয়ত ভুলতে বসেছি, তাদেরকে হারিয়ে ফেলছি ইতিহাসের পাতায়। তাই আমরা আজকে সেইসব সংগ্রামী নারীর কথা আলোচনা করবো, যারা সত্যিকারের চেতনা এবং অদম্য সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বেদনা, শোষণ এবং যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছিলেন। ৭৬ তম স্বাধীনতা দিবসে সেইসব মহীয়ষীদের শ্রদ্ধা জানাই।

বীনা দাস ঃ ১৯১১ সালের ২৪শে আগষ্ট কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলার এক স্বাধীনতা সংগ্রামী নারী। বীনা দাস তাঁর পিতা ছিলেন বেণীমাধব দাস। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ছাত্র দরদী বিদ্যান শিক্ষক। আর বীনাদেবীর মাতা সরলা দেবী নিঃস্ব ও অসহায় মহিলাদের সাহায্যার্থে তৈরী করেছিলেন সরলা পুণাশ্রম। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর বই 'ভারত পথিক' থেকে জানা যায়, র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালীন তিনি বেণীমাধব দাসের ছাত্র ছিলেন। তখন থেকেই সুভাষের মনে দেশপ্রেমের গভীরতর দাগ কেটে গেছেন তিনি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলে ১৯৩২ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন গর্ভনর স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর গুলি চালিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বীনাদেবী। পরবর্ত্তীকালে তিনি যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে।

ননীবালা দেবী ঃ ননীবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৮ সালে হাওড়ার বালিতে। খুব অল্প বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। তবে তিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিধবা হন এবং বাবার কাছে চলে আসেন। ১৯১৫ খ্রীঃ ননীবালাদেবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী হওয়ার দীক্ষা নেন। রামচন্দ্রবাবুর স্ত্রী সেজে জেলে গিয়ে পিস্তলের খোঁজ নিয়ে আসা তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তিনি ১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি হিসেবে ছিলেন। তাঁর শেষ জীবন খুব অবহেলার সাথে কেটেছিল। তাঁকে পুলিশের ভয়ে কেউ আশ্রয় দিতে চায়নি। কষ্ট ও দুঃখ ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে কোনো এক সময়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর সঠিক তথ্য এখনও জানা যায়নি।

আভা দে ঃ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আভা দে কোনো পুরুষের থেকে কম ছিলেন না। তিনি তাঁর সাহস ও শারীরিক শক্তির জোরে জীবনকে তুচ্ছ করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি এমন একজন নারী, যিনি ইংরেজ পুলিশের ঘোড়ার লাগাম টেনে প্রতিরোধ করেছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে নারী সত্যাগ্রহ সমিতিতে যোগদান করেন। এরপর তিনি বেআইনি শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদান করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন এবং প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি থাকেন। ১৯৩৮ সালে দেওঘরে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

সরোজিনী নাইডু ঃ ১৮৭৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী হায়দ্রাবাদে জন্ম সরোজিনী নাইডুর। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় যোদ্ধা। পাশাপাশি সরোজিনী নাইডু দ্য নাইটিঙ্গেল অফ ইণ্ডিয়া নামক অভিধায় ভূষিত। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সাথে ডাণ্ডি পদযাত্রায় যোগ দেন তিনি। মহাত্মা গান্ধী গ্রেফতার হওয়ার পর ধরসানা সত্যাগ্রহে নেতৃত্বদেন তিনি। সরোজিনী নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালও হন তিনি।

ঝাঁসির রানি লক্ষীবাঈ ঃ ইংরেজদের শাসনকালে ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহের অন্যতম পথিকৃত লক্ষ্মীবাঈ। ভারতের ইতিহাসে বিপ্লবী নেত্রী হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দেশের সাহসী নারীদের প্রতীক হিসেবে গন্য করা হয় তাঁকে।

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল ঃ পেশায় চিকিৎসক ছিলেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। কিন্তু লোভনীয় চাকরী ছেড়ে তিনি আজদ হিন্দ ফৌজের রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্যতম সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা হিসেবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নারী সংগঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও ছিলেন তিনি।

মাতঙ্গিনী হাজরা ঃ মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন মেদিনী পুরের এক মহিয়সী বীরাঙ্গনা। ১৮ বছর বয়সে বিধবা হলেও দেশের প্রতি তাঁর ছিল এক নিবিড় ভালোবাসা। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে তাঁকে কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৯৪২ খ্রীঃ আগষ্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরে এক বিরাট মিছিলের সর্বাগ্রে তিনি জাতীয় পতাকা হাতে নেতৃত্ব দেন। পুলিশের গুলি লাগা সত্ত্বেও তিনি জাতীয় পতাকা ভূমিষ্ট হতে দেননি। অবশেষে পুলিশের আরেকটি গুলির আঘাতে বন্দেমাতরম উচ্চারণের মাধ্যমে ভারতমাতার কোলে লুটিয়ে পড়েন এই বীরাঙ্গনা।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ঃ তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের মাস্টারদা সূর্য সেনের দলের অন্যতম মহিলা বিপ্লবী। ১৯৩২ সালে ৮ জন সাথি নিয়ে তিনি ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমন করেন। সেখানে রক্ষীদের আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। সাথীরা সবাই পালিয়ে যাওয়ায় প্রীতিলতা পটাশিয়াম সায়ানাইড মুখে দিয়ে আত্মবলিদান দেন।

কমলা দাসগুপ্ত ঃ ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটান জেলে (১৯০৭ - ২০০০)। তিনি ছোটবেলা থেকেই দেশপ্রেমী ছিলেন। তিনি ব্রিটিশদের উপর আঘাত হানবার জন্যে ট্রাঙ্ক ভর্তি বোমা লুকিয়ে রাখতেন। এছাড়া তিনি ডালহৌসি স্কোয়ার মামলায় যুক্ত ছিলেন। তিনি কোলকাতার কুখ্যাত কমিশনার চার্লস টেগারকে মারতে চেয়েছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হন।

শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ঃ সশস্ত্র বিপ্লবের দুই মহিলা সৈনিক শান্তি ঘোষ (১৯১৬ - ১৯৮৯) ও সুনীতি চৌধুরী (১৯১৭ - ১৯৮৮)। তাঁরা দেশাত্মবোধক গানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কুমিল্লা জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনে তাদের কিশোরীমন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তারা রিভলবার চালানো শিখেছিলেন। কুমিল্লা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে তাঁর বাংলোতে গিয়ে সামনে থেকে গুলি করেছিলেন। পরবর্তীতে শান্তিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ও সুনীতিকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদি বলে ঘোষণা করে ইংরেজ সরকার।

কল্পনা দত্ত ঃ (১৯১৩ - ১৯৯৫) খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব দেন এবং কারা দণ্ডিতে তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়।

সুশীলা মিত্র ঃ কোনও অস্ত্র না ধরেও যে কত বড়ো আত্মত্যাগ করা যায় তা বুঝেছিলেন ত্রিপুরার আশাকাঠির সুশীলা মিত্র (১৮৯৩ - ১৯৪৮)। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন। তিনি নিজেকে দেশের কাজে নিয়জিত করেছিলেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

লতিকা ঘোষ ঃ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে লতিকা ঘোষ (১৯০২ - ১৯৮৩)। তিনি জীতীয়তাবাদী মনোভাবের জন্য বেথুন কলেজের চাকরী ছেড়ে গোপনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। মহিলাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিযুক্ত করতেন। সায়ানাইড খেয়ে বীরবিক্রমে মৃত্যুবরণ করেন।

লাবণ্যপ্রভা দত্ত ও শোভারাণী দত্ত ঃ ১৯৩০ - ৩২ সালে লাবণ্যপ্রভা দেবী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। কন্যা বিপ্লবী শোভারাণী দত্তের সহায়তায় 'আনন্দমঠ' সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মান করেন। পাঁচবার লাবণ্যপ্রভা দত্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী ছিলেন।

অ্যানি বেসান্ত ঃ (১৮৪৭ - ১৯৩৩) খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই ইংরেজ নারীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি কংগ্রেসে যোগদান করে 'হোমরুল আন্দোলন' শুরু করেছিলেন। এই আন্দোলন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিশাল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এ ছাড়াও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হাজার হাজার নারীর অবদান ছিল। কিন্তু বেশীরভাগই পর্দার আড়ালে রয়ে গিয়েছেন। ঘরে ও বাইরে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের পাশাপাশি এঁরা মেয়েদের কল্যাণে করে গেছেন বহু কল্যাণমূলক কাজ। নারী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অতীতে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই বীরত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে এখনকার নারীরা সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে এগিয়ে চলেছে পুরুষের পায়ে পা মিলিয়ে। শুধুমাত্র পুরুষতান্ত্রিক বা শুধুমাত্র নারীবাদী দিয়ে সমাজ এগোয় না, সমাজ এগোয় যখন আমরা সবাইকে সম্মান দিয়ে একসাথে দিনগুলোতে বেঁচে থাকার লড়াইটা জারি রাখি।

তাই দেশের সেই সংগ্রামী বীরবালাদের আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

Prithwi Mandal (3rd Sem.)

Ranajit Guha

Rajesh Das (Office Staff)

Rina Biswas, (3rd Sem.)

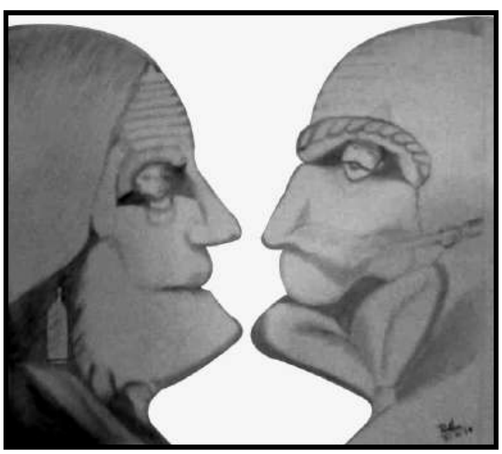

Partha Sarma (3rd Sem.)

TEACHING STAFF

FACULTY OF ARTS

DEPARTMENT OF BENGALI :

1. Dr. Sibsankar Pal (M.A, B.Ed., Ph.D.) Associate Professor & Officer-in-Charge
2. Dr. Nitish Ghosh (M.A, B.Ed., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
3. Dr. Shubhadip Debnath (M.A, M. Phil., Ph. D.) Assistant Professor

DEPARTMENT OF ENGLISH :

1. Saidul Haque (M.A, M. Phil., Ph.D. pursuing), Assistant Professor & Head of the Department

DEPARTMENT OF HISTORY :

1. Raghunath Roy (M.A, B.Ed.) Assistant Professor & Head of the Department
2. Gopal Mandal (M.A, B.Ed.), Assistant Professor
3. Pallabi Chatterjee (M.A, Ph.D. pursuing), Assistant Professor

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY :

1. Dr. Liza Dutta (M.A, M. Phil., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Md. Najir Hossain (M.A, B.Ed. Ph.D. pursuing), Assistant Professor
3. Priya Tudu (M.A, M. Phil., B.Ed.), Assistant Professor

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE :

1. Abhirupa Majumder (M.A.; M.Phil; Pursuing Ph.D) Assistant Professor & Head of the Department

FACULTY OF SCIENCE

DEPARTMENT OF PHYSICS

1. Dr. Swarup Ranjan Sahoo (M.Sc., Ph.D.), Associate Professor & Head of the Department
2. Dr. Jyotirmoy Maiti (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
3. Dr. Ajoy Mandal (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
4. Dr. Sumit Kumar Das (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor

DEPARTMENT OF CHEMISTRY :

1. Dr. SK Basiruddin (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Dr. Sanjoy Satpati (M.Sc., B.Ed., Ph.D.), Assistant Professor
3. Dr. Ramij Raja Mondal (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
4. Susmita Chowdhury (M.Sc., Ph. D. pursuing), Assistant Professor

DEPARTMENT OF MATHEMATICS :

1. Dr. Supratim Mukherjee (M.Sc., B.Ed., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Dr. Haridas Biswas (M.Sc., B.Ed., Ph.D.), Assistant Professor
3. Dr. Md. Abul Kashim Molla (M.Sc., B.Ed., Ph. D.), Assistant Professor

LIBRARIAN

Gouranga Mondal

(M.Sc., M.Lib. & I.Sc.)

NON-TEACHING STAFF

OFFICE STAFF :

1. Tridip Sinha (Upper Division Clerk)
2. Rajesh Das (Cashier)
3. Sk Nasir (Office Peon)
4. Maitra Sarder (Night Guard)
5. Subrata Halder (DEO)
6. Debabrata Mondal (DEO)
7. Puspita Saha (DEO)

SECURITY GUARD :

1. Krishna Kanti Halder
2. Sankar Kumar Biswas
3. Sadhan Bairagya
4. Sarthak Dutta

KARMABANDHU :

1. Mitali Halder
2. Nepal Halder

সৌম্যদীপ হালদার, তৃতীয় (যুগ্ম)
ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা

প্রিতম রায়, তৃতীয় (যুগ্ম)
ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা

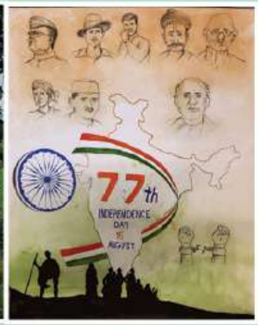

সৌরভ বিশ্বাস, ৬ষ্ঠ সেমিষ্টার,
ইতিহাস, পোষ্টার প্রতিযোগিতা

শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ

নাটক উপস্থাপন

দিশা গুঁই, দ্বিতীয়,
পোষ্টার প্রতিযোগিতা

আকাশ বিশ্বাস
অঙ্কন প্রতিযোগিতা

শিক্ষক দিবস পালন

শিক্ষা মূলক ভ্রমণ (ইতিহাস বিভাগ)

প্রাক শারদীয়া অনুষ্ঠান

দীপাশ্রী বিশ্বাস, প্রথম,
ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা

অভিভাবক-শিক্ষক মিটিং

পূজা দত্ত
অঙ্কন প্রতিযোগিতা

পড়ুয়া সপ্তাহ পালন

প্রাক্তনীদের সমাবেশ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (লং জাম্প)

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

স্মৃতিচারণ হিরোসিমা ও নাগাসাকি ডে

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন ২০২৩

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড উপলক্ষে সচেতনতা শিবির

বক্তব্য উপস্থাপন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালন

বার্ষিক পত্রিকা

ধনধান্য

শিক্ষাবর্ষ ২০২৩-২০২৪

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তেহট্ট

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. শিবশংকর পাল কর্তৃক মহাবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত

মুদ্রণে ঃ আর্ট প্রেস, রানাঘাট, নদিয়া ● মুঠোফোন ঃ ৯০৬৪৭৫৭২২১